ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন ও গান

শ্যামল চক্রবর্তী

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন ও গান

শ্যামল চক্রবর্তী

অক্ষর পাবলিকেশনস্

JHAR JE TUMAR JOYODDHAJA
Debabrata Biswas-er Jeeban-o-Gan
By *Syamal Chakrabartii*

২২শে আগস্ট ২০১১

প্রচ্ছদ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
শুভব্রত দেব
অক্ষর পাবলিকেশনস্
জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

ISBN : 978-81-89742-46-1

যাঁর পিতৃপ্রতিম ভালোবাসা পেয়েছি

'বাংলা গানের শেষ ভাণ্ডারী'

বিমান মুখোপাধ্যায়-কে

প্রকাশকের কথা

সবিতাব্রত দত্ত লিখেছিলেন, 'দেবব্রত বিশ্বাসের মত একজন শিল্পী আর হবেন কিনা সন্দেহ,—কারণ সায়গল একজনই হয়েছেন, শচীনদেব বর্ম্মনও তাই এবং পঙ্কজ মল্লিকও তাই।'

যখন এই পংক্তিগুলো আমার চোখে পড়ল, আমি রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। আমার প্রিয় শিল্পীদেব তালিকা তাহলে কয়েকদশক আগেই কেউ লিখে রেখেছিলেন?

প্রকাশনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলার পর মনে হল, শ্রদ্ধা জানানোর একটাই ক্ষুদ্র সামর্থ্য রয়েছে আমার। তাঁদের জীবন ও কাজের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। কে হবেন আমার সঙ্গী এমন কাজে? পরিশ্রম করতে তো তিনিই রাজি থাকবেন যিনি একাজে 'আনন্দ' খুঁজে পান।

শচীনকর্তার উপর আমাদের দেশে প্রথম বই লিখে সে প্রমাণ দিয়েছিলেন বন্ধু শ্যামল চক্রবর্তী। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও স্বভাবতই তাঁর কাছেই নিবেদন করলুম। কী পরিশ্রম করেছে সে, কতো জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, বোধহয় এ নিয়েও একটি বড়ো বই হয়ে যেতে পারে।

কিংবদন্তী এই শিল্পীর জীবন অনুসন্ধান করেছেন শ্যামল। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের এই শ্রদ্ধানিবেদন আপনাদের হাতে বিনম্রচিত্তে তুলে দিলাম।

শুভব্রত দেব

গান বিষয়ে লেখকের আরও বই

পল রোবসন

মাটির সুরের রাজা আব্বাসউদ্দীন

ভাটি গাঙ বাইয়া : শচীন কর্তার জীবন ও গান

মাহুত বন্ধু রে : প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের জীবন ও গান

শুভেচ্ছা

জর্জদার জীবিতকালে এবং পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক লেখা হয়েছে।
কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই লেখা প্রথম।
তাঁকে নিয়ে চর্চার অবকাশ আছে।
সত্যসন্ধানী মন নিয়ে দেখলে সদুত্তর পাবেন।
শ্যামল চক্রবর্তী-র প্রচেষ্টা সফল হোক।
শুভেচ্ছা রইল।

সবিনয় নিবেদন

"আমার আত্মজীবনী তো এক পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে যাবে।... 'সংগীত-জীবন' নাম দেওয়া যেতে পারে এমন কোনো আলাদা বা বিশেষ ধরনের জীবনধারার অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনেও হয়নি। সেই বাল্যকালে কবে থেকে গান গাইতে শুরু করলাম তা আমার মনেও নেই—গান গাইছি-তো-গাইছি-তো গাইছি।... ছোটবেলার দিনগুলি থেকে শুরু করে, বড় হয়েও শুধু গান শুনেছি আর গেয়েছি।"

এই কথাগুলো এককালে যিনি নিজের লেখা বইয়ের পাতায় লিখেছিলেন তিনি আর কেউ নন। দেবব্রত বিশ্বাস। জর্জ বিশ্বাস নামে যাঁর আর এক পরিচয়। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, কখনো কোনোকালে তিনি গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে গান শেখেননি। অথচ রবীন্দ্রনাথের গানের সকল ভাব আর সুর নিয়ে আমাদের সামনে যিনি স্পষ্ট প্রতিমা গড়ে তোলেন তিনি দেবব্রত বিশ্বাস। মনে পড়ে আজও, আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র। একদিন সহপাঠী শান্তনুর কাছে খবর পেলাম, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তাঁর এক পিসীমা থাকেন যিনি গাছ গাছড়া থেকে হাঁপানি সারিয়ে তোলার ওষুধ দিতে পারেন। এ খবর কি তবে শিল্পীর অগণন অনুরাগীর কারও কাছেই পৌঁছয়নি? এক শনিবার দুই বন্ধুতে মিলে চলে গেলাম বিষ্ণুপুরে। দিন দুই থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরলাম কলকাতায়। কিন্তু জর্জের কাছে যাব কেমন করে? আমরা তাঁকে চিনি। তিনি তো আমাদের চেনেন না। তখনই মনে পড়ল অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্তের কথা। প্রণবদা বহুবছর আগরতলায় পড়িয়েছেন। পরে কলকাতায় এসে অধ্যাপনার চাকুরি নিয়েছেন। সলিল চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাসের অনেক গল্প, বিশেষত গণনাট্য আন্দোলনের কথা তাঁর কাছে ছাত্রজীবনে অনেক শুনেছি। তিনি জর্জ বিশ্বাসকে চিনতেন। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে তাঁকে সব কথা জানালাম। তিনি একদিন আমাদের দুজনকে নিয়ে শিল্পীর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র বাড়িতে গেলেন। আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ত্রিপুরার ছেলে জানতে পেরে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আনারসী কে চেনেন?' এমন নাম হয় নাকি কারও? আমি মাথা নাড়লাম। 'চেনেন না? আপনাগো দ্যাশেরইত মাইয়া। আমার ছাত্রী। হগলে তারে বিভা নামে চেনে। আমি আনারসী কই।' প্রণবদা যাবার সময় একগুচ্ছ রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পীকে দিতে যেতেই তিনি বলে উঠলেন,

'এসব লইয়াইছেন ক্যান? মরলে পরে আমার ডেডবডির উপর আইন্যা রাইখ্যা যাইয়েন। কাম দিব।' প্রণবদা ও আমাদের মুখের চেহারা কেমন হতে পারে অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই। হয়তো শিল্পীর মনে হল, বড়ো বেশি ঘা দিয়ে ফেলেছেন তিনি। মুচকি হেসে প্রণবদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাগ কইরেন না। জানেনত আপনে, ফুলের গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া এসব রাবীন্দ্রিক জিনিস আমার সহ্য হয় না।' কী জানি কেন মনে হল, ফুল দিয়ে আমরা তাঁকে কষ্ট দেব কেন? খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো আমরা সরিয়ে নিলাম। প্রণবদা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন শিল্পীর লেখা 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বইটি। বইয়ের পাতা খুলে তিনি জর্জদাকে একটি অটোগ্রাফ দিতে বলেন। কী সহজ সরল উত্তর ছিল তাঁর। 'বইডা আপনেই আনছেন, আমি দেই নাই। কী লেখ্‌মু তবে। দ্যান।' প্রণবদা বইটি জর্জদার হাতে দিতে জর্জদা লিখলেন, 'বইটি আমার নয়, সইটি আমার। দেবব্রত বিশ্বাস।'

ঘরের বাইরে ছোট্ট চাতাল। সেখানে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। এবার আমাদের আসার কারণ জানালাম। কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেলেন হঠাৎ। বললেন, 'দিয়া যান, খামু।' আমি বললাম, 'যে কদিন ওষুধ খাবেন, পেঁয়াজ খেতে পারবেন না।' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'বুঝলেন না, কেউ যখন জলে ডুইব্যা যায়, একটা খড়ের গাছা পাইলেও চাইপ্যা ধরে। কইছেন যখন, মাইন্যা চলুম।'

সেদিন আর বেশি কথা হল না। চলে এলাম। পরে কয়েকবার গিয়েছি। গেলেই প্রথমে প্রতিবার জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনার সাবজেক্টটা যেন কী, ফিজিক্স না কেমিস্ট্রি?' খুব বেশি কথা বলার সাহস হত না। কী-ই বা বলব তাঁর সঙ্গে? বলতেন, 'ওষুধডা অল্প অল্প কাম করতাছে মনে হয়।' আজ বুঝতে পারি, হয়তো খুশি করতে চাইতেন আমাদের। হাঁপানির হাত থেকে তিনি আর নিস্তার পেলেন কই?

একদিন হয়তো তাঁর মনটা প্রফুল্ল ছিল। ঢুকতেই একটা মোড়া দেখিয়ে বসতে বললেন। কেন জানি না, ভূমিকাহীন ভাবেই বলতে থাকলেন, 'জানেন, আমাগো দ্যাশের রেকর্ড কোম্পানিগুলা ব্যবসা করতে আজও শিখে নাই। এই যে হেমন্তরে আপনারা শুনেন, ওঁর গলার কিছুইত শুনতে পান না। বাইরের দ্যাশে কী হয় জানেন? একজন আর্টিস্টের গলা যখন তুঙ্গে থাকে, অনেক গান একসঙ্গে রেকর্ড কইর্‌য়া রাইখ্যা দেয়। ধীরে ধীরে বাজারে ছাড়ে। গলার লাইগ্যা শিল্পী কহনো মাইর খায় না। এ দ্যাশে হালায় গলা পইরা গেলে রেকর্ড কোম্পানি মাল বাজারে ছাড়ে।' জবাব দেবার কী যোগ্যতা ছিল আমার? একমনে শুনে যাচ্ছিলাম তাঁর কথা। প্রণবদার কাছে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের গণনাট্যের দেবব্রতর কথা অনেক শুনেছি। সাহস নিয়ে বললাম, 'আপনার বেলায়ও তো একথা সত্যি।' হেসে

বললেন, 'আমার কথা রাহেন। আমার গান ত হেরা মাইর‍্যা ফালাইয়াই দিল।' এরপর আর এই নিয়ে কথা এগোয় কেমন করে? চুপ করে রইলাম। নিজে থেকেই বললেন, 'এবার তাইলে যান'।

সেদিনের পর আর যাওয়া হয়নি আমার। মনে হত, কী বলতে যাব? লোভ যে হত না তাঁর কথা শোনার, সে কথা বলব না। আমার যা যোগ্যতা, এতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভেবেই আর যেতে সাহস করিনি।

তারপর এল সেইদিন। ১৯৮০ সালের আঠারোই আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রাহক হবার ফর্ম সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। কে যেন খবরটা দিল, জর্জদা আর নেই। কী করব? লাইনে দাঁড়াব না? চলে যাব অনুরাগীদের ভিড়ে মিশে যেতে? আজীবন রবীন্দ্রনাথকে নিয়েইতো কাটিয়েছেন তিনি। সেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার নিজের সংগ্রহে রাখার অভিপ্রায়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। জানলে তিনি কি অখুশি হতেন? হতেন না। অনুপ্রেরণা দিতেন। তাই তাঁর শেষযাত্রায় সঙ্গী হতে যাইনি সেদিন। একটা ফর্ম সংগ্রহ করে ছাত্রাবাসে ফিরে এক বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতায় দিন কাটিয়েছি।

বেশিদিন আগের কথা নয়। তখনও 'প্রমা'র সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ বেঁচে। তাঁকে একদিন জর্জদার এসব গল্প বলছিলাম। তিনি আমায় বললেন, "একটা বই তাঁকে নিয়ে লিখুন না আপনি। 'প্রমা' থেকে ছাপব"। নারাজ হইনি যদিও, খুব একটা প্রস্তুতির পথেও পা বাড়াইনি। সম্প্রতি বন্ধুবর শুভব্রত প্রস্তাব দিতেই মনে হল, জর্জদাকে নিয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকলে খারাপ লাগবে না। শুভব্রত আমার শচীনকর্তার উপর বই বের করেছে। বিজ্ঞানের গোটাকয় বই ও 'চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণ' ছাপিয়েছে। তাঁর হাতে জর্জদার জীবন ও গানের একটা পাণ্ডুলিপি তুলে দিলে মন্দ হয় না। মুখোমুখি বসে আমি তাঁর গান শুনেছি সামান্য। পরিচয় হয়েছিল সে-ও সামান্য ক'দিনের জন্য। নিজের অভিজ্ঞতা আর তাঁকে নিয়ে কতটুকু? এই গ্রন্থে আমার লেখক ভূমিকার চেয়ে সংগ্রাহকের ভূমিকাই প্রধান। যাঁরা জর্জদাকে অনেকদিন ধরে দেখেছেন, তাঁর কাছে গান শিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। জর্জদাকে নিয়ে তাঁদের অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা লিখেছেন অনেকেই। সেই স্মরণসম্ভার থেকে তাঁদের সম্মতি নিয়ে কিছু নির্বাচিত স্মৃতিকথা সংকলিত করেছি। গণনাট্য সংঘের সময় থেকে যে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করেছেন জর্জদা, তাঁদের স্মৃতিচারণা ও আলোকচিত্র এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ একটি কিশোর উপন্যাসে দেবব্রত বিশ্বাসের কথা লিখেছেন। দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্র বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ শিল্পীর কথা লিখেছেন তাঁর এক উপন্যাসে। প্রবীণ প্রকাশক সবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানুদা) তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে জর্জদার কথা বলেছেন। তিনজনের সম্মতি নিয়ে সেই লেখাগুলি

আমরা একটি পরিচ্ছেদে যোগ করেছি। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর 'জর্জ বিশ্বাস' তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য মুদ্রণে আমায় যে সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন সূত্র থেকে সাধ্যমত জর্জ বিশ্বাসের রেকর্ড, ক্যাসেট ও সিডি-র তালিকা সংকলিত করেছি। চেয়েছি হোক একটি পূর্ণতালিকা। হয়েছেই যে, এমন নিশ্চিত দাবি করতে পারব না। আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে অর্ঘ্য সেন, ইন্দ্রাণী সেন, শৈবাল মিত্র ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাসের কথা বলতেই হয়। চিঠিপত্র ও ব্যঙ্গচিত্র যেখানে যতোটা পেয়েছি, এই বইয়ে জুড়তে কার্পণ্য করিনি। সবশেষে বলব আরও দুইজনের কথা। জর্জদার 'আনারসী' আমাদের বিভাপিসী, বিভা সেনগুপ্ত ও শিল্পীর সবশেষ ছাত্র অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে যে সহৃদয় সহযোগিতা করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। সহায়তা পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রিয় ও অনুজ সহকর্মী ড. অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সৌমিত্র লাহিড়ির সহায়তা ভুলব না। সুররসিক ও সুপরিচিত সাংবাদিক সুবোধ বসু ও অনুজ বন্ধু ডা. তমোনাশ ভট্টাচার্য আমাকে যথাক্রমে অনাদিকুমার দস্তিদার ও চিন্মোহন সেহানবীশের আলোকচিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন। প্রিয়বন্ধু 'নাটক-পাগল' নিখিলরঞ্জন প্রামাণিকের কথা ভুলব না। তাঁদের আমি অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিশিষ্ট শিল্পী দেবব্রত ঘোষ। বন্ধুত্বের খেসারত দিতে দিতে তিনি কবে বিস্ফোরণে মেতে উঠবেন, সেই আশঙ্কায় দিন গুনছি। বলতে ভালো লাগছে, 'ভাটি গাঙ বাইয়া' বইটির প্রচ্ছদও তাঁরই। ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সাড়া জাগানো পরিবেশনা ছিল জর্জদার, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি'। সে গানেরই তো একটি লাইন, 'ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা'। কথাটা উচ্চারণ করলে জর্জদার জীবনযাপনের সঙ্গে কেমন যেন মিল খুঁজে পাই আমরা। আর সে সূত্র ধরেই বইটির নামকরণ হয়েছে। সবশেষে দু একটা কথা বলব। বিভিন্ন গুণীজনের স্মৃতিমূলক নিবন্ধ ও নানাজনের লেখা চিঠিপত্রগুলির বানান আমরা অপরিবর্তিত রেখেছি। 'প্রচলিত' ও 'অপ্রচলিত' বানানের কোনো সীমারেখা টানিনি। কোথাও মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়লে তা সংশোধন করতেই হয়েছে।

জর্জদার নিবিড় বন্ধু খালেদ চৌধুরী অসুস্থতা সত্ত্বেও শুভেচ্ছা লিখে দিয়েছেন। তাঁকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে দেবব্রত বিশ্বাস এক দ্যুতিময় চরিত্র। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের এই প্রণতি নিবেদন শিল্পীর অনুরাগী বন্ধুরা সংগ্রহযোগ্য মনে করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আগস্ট ২০১১ শ্যামল চক্রবর্তী

সূচী

স্মরণ : দেবব্রত বিশ্বাস

রাজেশ্বরী দত্ত ও দেবব্রত বিশ্বাস

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র

সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস

মায়া সেন ও দেবব্রত বিশ্বাস

অর্ঘ্য সেন ও দেবব্রত বিশ্বাস

মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

: হোমচৌধুরীর সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস
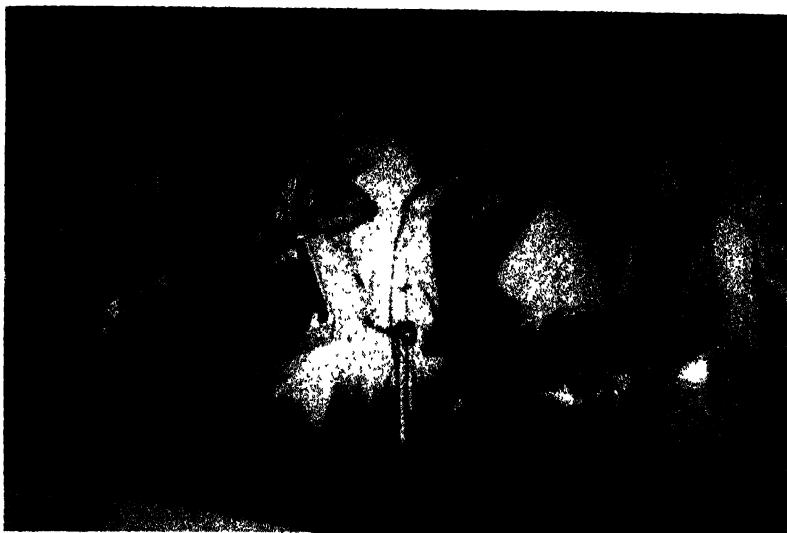
হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেবব্রত বিশ্বাস

'হেথায় আমি থাকি শুধু গাইতে তোমার গান।'
নিজের ছোট্ট ঘরে সুরসাধনায় মগ্ন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

। আসরে সেই সুপরিচিত ভঙ্গিমায়

এক নিবিষ্ট মুহূর্তে শিল্পী

শিল্পীর স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র

সঙ্গীত পরিবেশনায় মগ্ন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

চিন্মোহন সেহানবীশ

খালেদ চৌধুরী

'অনেক দিনের আমার যে গান......।' সাধারণ সাজে শিল্পীর অসাধারণ নিবেদন
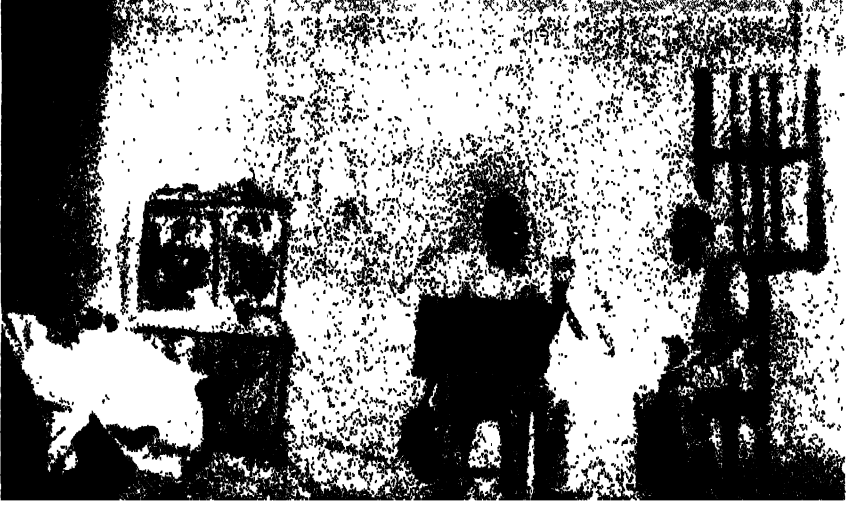
তুলসী লাহিড়ী রচিত 'ছেঁড়া তার' নাটকের একটি দৃশ্যে
অশোক মজুমদার, দেবব্রত বিশ্বাস ও শম্ভু মিত্র
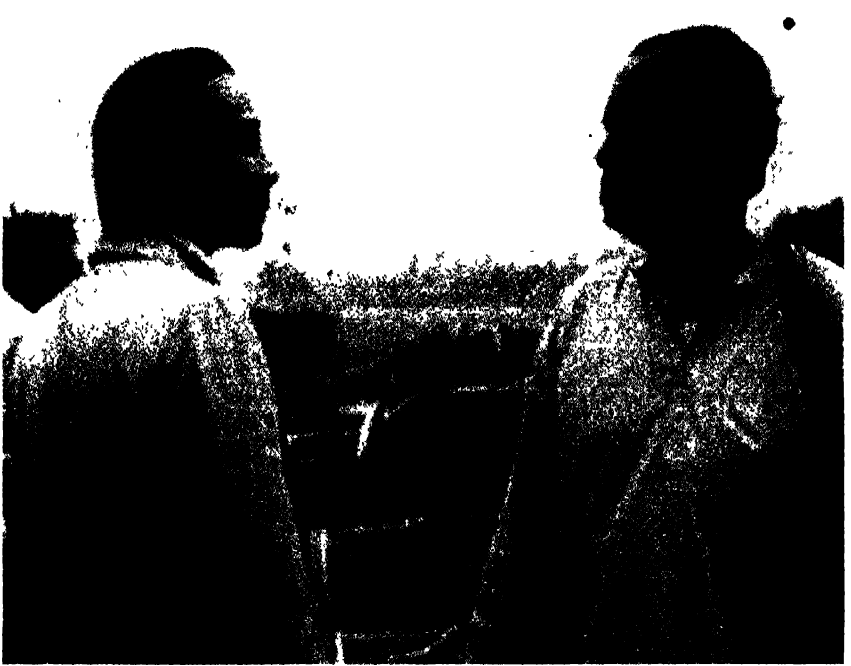
ঋত্বিককুমার ঘটক পরিচালিত 'কোমল গান্ধার' ছবিতে
বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৫। ছদ্মবেশে গান শুনতে এসেছিলেন
রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে। এমন শিল্পী কি সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন?
শ্রোতাদের কাছে তিনি ধরা পড়ে যান।

চীনদেশ সফরে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস (ডানদিকে)
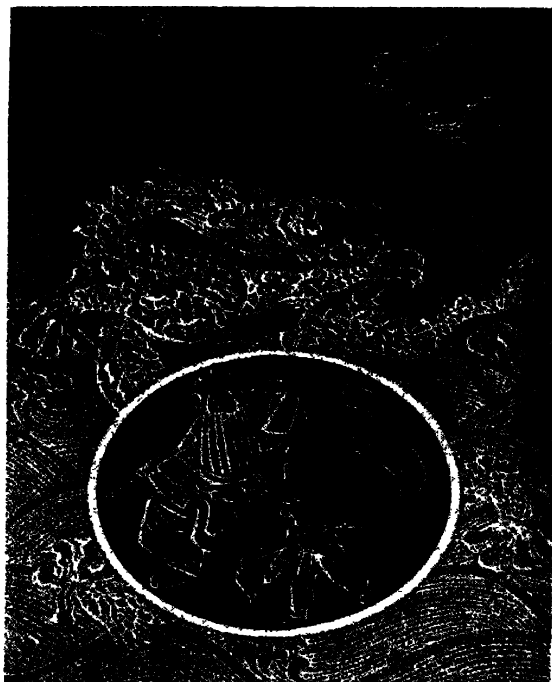
'অন্তরঙ্গ চীন' বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্র। শিল্পী খালেদ চৌধুরী

াত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্র। শিল্পী খালেদ চৌধুরী।
প্রচ্ছদ আলোকচিত্র বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়

হ'য়ে আইসক্রীমের কাগজের খোসাটি রাস্তা থেকে তুলে গেটের পাশে আবর্জনা ফেলবার বাক্সে ফেলে দিয়ে ছেলেটিকে কি জানি বোঝালেন। তাঁর গলার আওয়াজে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। ছেলেটি মাথা নেড়ে আবার পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লো। পার্কের একজন 'গেটম্যান' কী বা তাঁর বিদ্যে বুদ্ধি; কিন্তু এই বুদ্ধি দিয়েই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার কাজে তিনি যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলেন তার তুলনা হয়তো শুধু ওদেশেই মেলে।

একদিন পিকিং শহরের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে খানা পিনার ব্যবস্থা হোল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বাড়িতে। চমৎকার বাড়ি—আধুনিক ফ্যাসানের আরামদায়ক ব্যবস্থা সবই রয়েছে, সাঁতার দেবার জন্যে সুইমিং পুলটিও বাদ নেই। সেদিন চীনের বড় বড় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাবেশ হয়েছে—আমরাও বিদেশ থেকে এসেছি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে—অতএব এরকম একটি ঐতিহাসিক সমাবেশে ভাবের আদান-প্রদান হওয়া নিতান্তই দরকার। তাই ঠিক হোল, আমরা তিনভাগে বিভক্ত হ'য়ে আলাপ-আলোচনা করব। উভয় দেশের গানবাজনার শিল্পীরা একজায়গায় এবং সাহিত্যিকরা আর একটি জায়গায় ব'সে আলোচনা শুরু করলেন। নৃত্যশিল্পী ও সাহিত্যিকদের আসর কি ধরনের হল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ আমি ছিলাম গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে। আমাদের আসরে ওঁদের পক্ষ থেকে এসেছেন

কাও-ডই পাও ছিল অত্যন্ত দরিদ্র চাষী—পরের জমি চাষ করে কোনমতে পেট চালাতো। কোনদিন পেট পেতো কোনোদিন হয়তো উপোস ক'রেই দিন কাটাতে হ'ত। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া করার ভারি সখ ছিল। একটু বড় হ'য়ে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পয়সার অভাবে একবছরের বেশী পড়াশোনা হ'ল না। সৌভাগ্যক্রমে চীনে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই সুযোগে কাও মুক্তিফৌজে নাম লেখালো। ফৌজে ঢুকে তার প্রথম কাজ হোল মুক্তিফৌজের অফিসের সদর দরজায় বসে থাকা এবং বাইরে থেকে যেসব চিঠিপত্র আসতো সেগুলো অফিসের ভেতরে জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়া। এই কাজ করতে করতে সে কিছু কিছু পড়তে শিখে গেলো। ফৌজের দু'একজন প্রবীণ সাহায্যে, চীনের জমিদার ও সামন্তদের সম্বন্ধে দু একটা বই পড়ে ফেলার পর মনে হোল তার নিজেরও এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। এই জমিদারদের হাতে কী যে নির্যাতন তাকে ভোগ করতে হয়েছে সেইসব কাহিনী জানাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা অন্যান্য দেশের মতো অত সোজা নয়। কাও শুধু পড়তে জানে, লিখতে জানে না। [illegible] বন্ধুদের সাহায্যে সে লিখতে শেখার কাজ শুরু করে দিল। খানিকটা চীনে অক্ষর, খানিকটা ছবি দিয়ে তার মনের ভাব সে প্রকাশ করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে লেখার নেশা তাকে এতো বেশি পেয়ে বসেছিল যে, মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করতে করতে যখন দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল কাও মুক্তিফৌজের

খালেদ চৌধুরীর অলঙ্করণে সমৃদ্ধ 'অন্তরঙ্গ চীন' বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস(১৯৭৯)।
দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্নেহাংশুকান্ত আচার্য

শিল্পীকে সংবর্ধিত করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দাঁড়িয়ে বাঁদিকে পাশে পার্থ ঘোষ।
ডানপাশে বৌদি কনক বিশ্বাস।
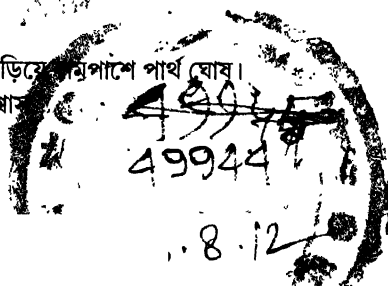
রবীন্দ্রসদনে শিল্পীর সঙ্গে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, ফাহমিদা খাতুন, আবদুল আহাদ, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কাদেরী কিব্রিয়া ও আরও অনেকে

দেবব্রত বিশ্বাস, অর্ঘ্য সেন, শ্যামল মিত্র, সুমিত্রা সেন, ধীরেন বসু ও বন্দনা সিংহ

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও রুমা গুহঠাকুরতা

'সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা।' ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

শ্রোতাদের সামনে শিল্পীর শেষ অনুষ্ঠান। পাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিম শরাফি

প্রিয়তম ভাগ্নে খোকন-কে (কুমার শঙ্কর) কোলে নিয়ে শিল্পী

'এসো জনতার মুখরিত সখ্যে....'। মিছিলে হাঁটছেন দেবব্রত বিশ্বাস
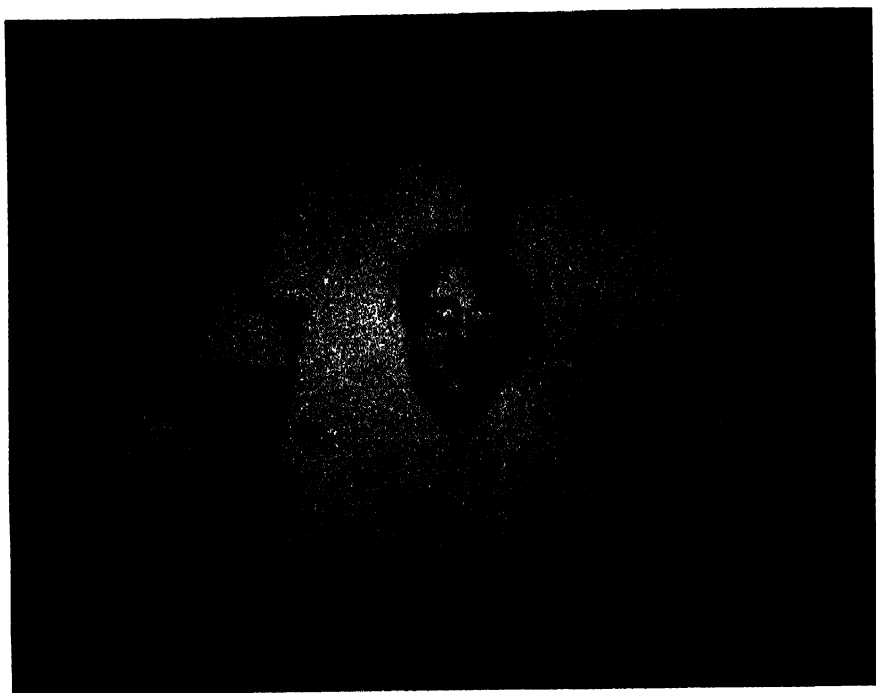
কর্মজীবনে সহকর্মীদের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

গণনাট্য আন্দোলনে নিবেদিত দুই ভাইবোন। রেবা রায় ও বিনয় রায়

গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত।
রেবা রায়চৌধুরী ও সজল রায়চৌধুরী

তিন বন্ধু : ইন্দুভূষণ রায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও প্রিয়গোপাল রায়

আদরের ভাগ্নি পারমিতার সঙ্গে মামা দেবব্রত

প্রখ্যাত শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা শিল্পীর পোর্ট্রেট

প্রখ্যাত শিল্পী অনুপ রায়ের আঁকা শিল্পীর পোর্ট্রেট। শিল্পীর স্বাক্ষরিত।

একটি দুর্লভ আলোকচিত্র : ভূপতি নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (বটুকদা), নিরঞ্জন সেন ও দেবব্রত বিশ্বাস
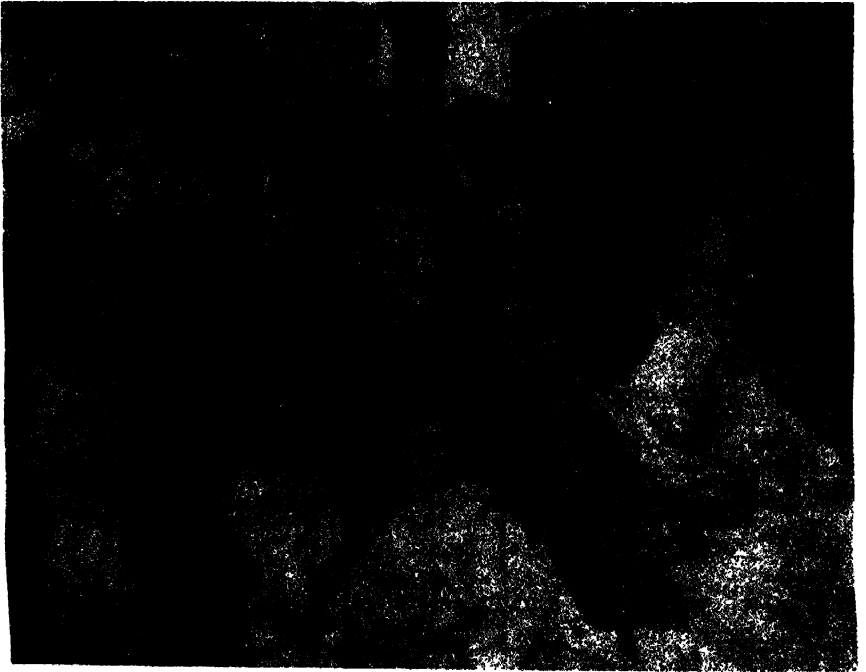
গণনাট্য সংঘের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী

মেয়ে রঞ্জাবতী ও মা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার

সাহানা দেবী

অমিয়া ঠাকুর

গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করছেন ইন্দুবালা দেবী। পাশে আঙুরবালা দেবী।
হারমোনিয়ামে জমিরুদ্দিন খাঁ ও তবলায় রাসবিহারী শীল।

অনাদিকুমার দস্তিদার

শান্তিদেব ঘোষ

পঙ্কজকুমার মল্লিক

সত্যজিৎ রায়

ঋত্বিককুমার ঘটক

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী পরিচালিত 'দেবব্রত বিশ্বাস'
তথ্যচত্রের অডিও সি.ডি.-র প্রচ্ছদ
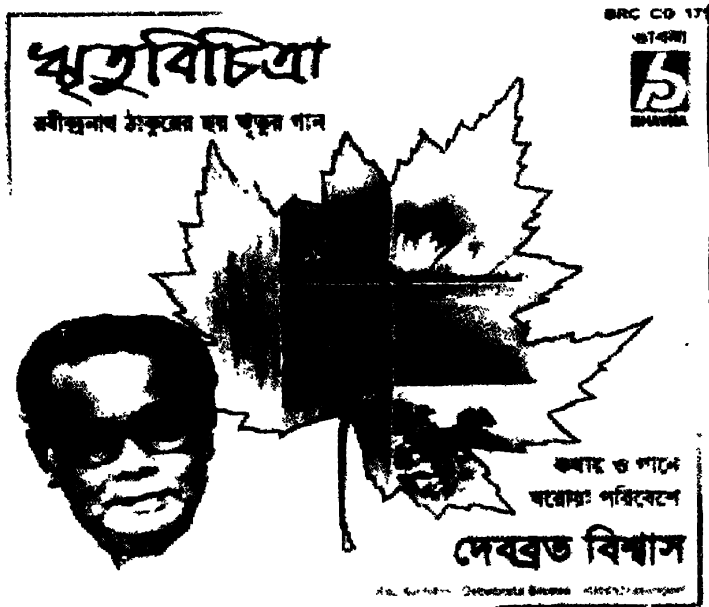
'ছয় ঋতুর গান'-এর সি.ডি.-র প্রচ্ছদ

সঙ্গীত ভবনের প্রথম যুগ। বাঁদিক থেকে তৃতীয় শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শিশু কিশোর জীবন

আমাদের দেশে যাঁকে আমরা নবজাগরণের প্রথম প্রাণপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছি তিনি রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭২ সালে (ভিন্নমতে ১৭৭৪) হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। 'আধুনিক ভারতের জনক' বলতে আমরা রাজা রামমোহন রায়কেই বুঝি। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বৈষ্ণব। মা তারিণীদেবী ছিলেন শক্তির উপাসিকা। সে সময় সাধারণত বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্ত পরিবারের বিয়ে হবার প্রচলন ছিল না। প্রকৃত বিচারে তাই এক ভিন্ন চরিত্রের পরিবারেই রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। তরুণ বয়সে রামমোহন হিমালয় ও তিব্বতের বহু জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন।

উনিশ কুড়িবছর বয়সে রামমোহন উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু সমাজে 'সতীদাহ' নামে যে ভয়াবহ কুপ্রথা ছিল তা নিবারণ করে বিশ্বপরিচিতি অর্জন করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে ঔদার্য ও আধুনিকতার আলোকে উদ্ভাসিত করতে চাইলেন রামমোহন। পশ্চিমী সভ্যতার গ্রহণীয় দিকগুলো মেনে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। দেশীয় শিক্ষাকে যুক্তিপূর্ণ করে তুলতে তিনি লর্ড আমহার্স্ট-এর সঙ্গে বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন। সে সময়ে উইলিয়াম কেরি ভারতে পাকাপাকি থাকতে শুরু করেছেন। হরিহরানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামে এক তান্ত্রিক সংস্কৃত পণ্ডিতের উদ্যোগে কেরি ও রামমোহনের পারস্পরিক পরিচিতি ঘটে। রামমোহন ভালো করে ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হন। 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মিরাত-উল-আকবর' নামে দুটো সংবাদপত্র চালু করেন রামমোহন। ছোটো ছোটো নানা পুস্তিকা লিখে হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ আচার আচরণের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ব্রাহ্মধর্মের মানুষেরা ছিলেন একেশ্বরবাদী। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। হিন্দুধর্মের মূলধারার মানুষেরা স্বভাবতই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে নানা বিষোদগার ও উষ্মা প্রকাশ করতেন। স্বয়ং রামমোহনকেই একাধিকবার তার শিকার হতে হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন যেসব সাধারণ মানুষজন, তারা যে সংকীর্ণতাবাদী হিন্দুদের রোষানলে পড়বেন এতো স্বাভাবিক। তেমন রোষানলের শিকার হয়েছিলেন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইটনা

গাঁয়ের একজন। তাঁর নাম কালীকিশোর বিশ্বাস। কালীকিশোরের 'অপরাধ' ছিল তিনি সনাতনী হিন্দুধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সত্যি বলতে কী, কারও ধর্মবিশ্বাসে কেউ আঘাত দেবেন না এই তো মানুষ্যত্বের ধর্ম। কালীকিশোর কিন্তু রেহাই পাননি। বাংলার কোথাও কোনো একজন মাত্র মানুষ ব্রাহ্ম হলে তেমন কী আর আসে যায়! দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর পিতামহ কালীকিশোরের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে তাঁকে তো একঘরে করা হলই, এমন কি নিজের গ্রাম থেকেও তিনি বিতাড়িত হলেন। ....১৮৯৭ সালে স্টিমার থেকে পদ্মা নদীতে পড়ে' তিনি মারা যান। এ কী নিছকই দুর্ঘটনা ছিল, না ক্রুদ্ধ হিন্দুধর্মী কোনো মানুষের অপকর্ম, আজ তা বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে এমন একটা সন্দেহ অনেক মানুষের মনেই দানা বেঁধেছিল। বহু অনুসন্ধান করেও কালীকিশোরের মরদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পারিবারিক সূত্রে দেবব্রত বিশ্বাস ব্রাহ্ম ছিলেন, শুধু এইটুকুই। এই নিয়ে তিনি কখনও আলাদাভাবে মাথা ঘামাননি। এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী নিজেই জানিয়েছেন, 'ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগ—আমার ঠাকুর্দা ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং বংশ পরম্পরায় আমিও ব্রাহ্ম। এই নামে ব্রাহ্ম আর কি। তবে ব্রহ্মা-ট্রহ্মার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।'

একসময় ইটনার ঠিকানা ছিল কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও জেলা ময়মনসিংহ। আজ কিশোরগঞ্জ নিজেই একটি জেলা। তার উত্তরে নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ-পশ্চিমে নরসিংদি, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পূর্বে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ। পশ্চিমে গাজিপুর ও ময়মনসিংহ। ইটনা আর গ্রাম নেই। উপজেলা। স্বাধীনতালাভের পর প্রশাসনিক সুবিধার কথা ভেবে বাংলাদেশে এই রদবদল হয়েছে। ইটনা উপজেলার অধীনে এখন ১১৭টি গ্রাম রয়েছে।

কালীকিশোর বিশ্বাসের চারপুত্র ছিল। বড়ো জ্যাঠামশাইকে দেবব্রত দেখেননি। বাকি তিনভাই হরকিশোর, দেবেন্দ্রকিশোর ও নগেন্দ্রকিশোর। দেবেন্দ্রকিশোর অবলাদেবীকে বিয়ে করেন। পরপর তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করেন অবলাদেবী। নবজাতকের আগমনে এক একটা সংসার কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দেবেন্দ্রকিশোরের সংসার প্রথম কবছর ছিল বিষণ্ণতায় ঢাকা। তিন মৃত সন্তানের পর অবলাদেবী এক সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ভয় আপনজনদের, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো? বেঁচে রইল সেই মেয়ে। বাবা আটমাস পর তাঁর নাম দিয়েছিলেন সান্ত্বনা। সান্ত্বনার পর ওই সংসারে জন্ম হল এক পুত্রসন্তানের। ১৯১১ সালের ২২শে আগস্ট। বাংলা ১৩১৮ সালের ৬ই ভাদ্র। তিনিই দেবব্রত বিশ্বাস। পাঁচবছর পর দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল ললিতা।

বরিশালে মামার বাড়িতে দেবব্রতর জন্ম হয়েছে। বাবা, মা ও দুই বোনের সংসারে দেবব্রত ছোটোবেলা থেকে বড়ো হয়েছেন। চারপাশটা খোলামেলা। ফুল ও ফলের বাগান। খাল বিল নদী। বড়ো হওয়ার মজাটাই আলাদা। দিদি সান্ত্বনা ছিলেন দেবব্রতর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়ো। বোন ললিতা বছর পাঁচেকের ছোটো ছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। ললিতা দাদার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> আমরা দুজনেই দুজনকে নাম ধরে ডাকতাম। বয়সের হিসাবে বছর পাঁচেকের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমি খোকা বলেই ডাকতাম—খোকাও আমাকে ডাকত খুকী বলে। বহুনামের মধ্যে 'জর্জ' নামটাই বেশী পছন্দ ছিল খোকার। বাড়ীতে সবাই ডাকত 'খোকা' বলে—কিশোরগঞ্জের পরিচিত মহলে 'দেবু'—পোশাকী নাম 'দেবব্রত', এসব ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশাল পরিচিতি পেয়ে গেল কিশোরগঞ্জের ইংরেজ নার্স-এর দেওয়া নাম 'জর্জ'।

দিদি সান্ত্বনা ছোটোবেলা থেকেই চুপচাপ। কম কথা বলতেন। ভাই ও ছোটোবোন ললিতার মধ্যে ভাব-ভালোবাসা মান-অভিমান ছিল বেশি। এই হয়তো দুজনে খুব ভাব। একটু পরেই রাগারাগি। আসলে সব বাড়িতে ছোটোরা এমন করেই বড়ো হয়। কিশোরগঞ্জের বাড়িতে কী চলত? 'উদ্দাম ছুটোছুটি, পুকুরে সাঁতার, গাছে চড়া, জম্বুরা (বাতাবীলেবু) পেড়ে নিয়ে খোকাতে আমাতে ফুটবল খেলা, কলাগাছের ভেলায় পুকুরে ভাসা।' একথা লিখেছেন ললিতা। পড়াশুনোয় নাকি দুজনের কারোরই মন ছিল না। তবে ললিতা আমাদের জানিয়েছেন, স্কুলের কোনো পরীক্ষায় দেবব্রত প্রথম না হয়ে দ্বিতীয় হননি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দেবব্রত ভালো ফল করেছেন। সংস্কৃত আর অঙ্কে লেটার পেয়েছেন।

বড়ো হওয়ার দিনগুলোতে এসব ছিল আনন্দের দিক। দুঃখ ও ব্যথা বেদনার দিকও ছিল। পরিণত বয়সে দেবব্রত লিখেছেন ছোটোবেলায় তাঁর দুঃখময় দিনগুলির কথা। কিশোরগঞ্জের কোনো হিন্দু পরিবার এই ব্রাহ্ম পরিবারকে সুনজরে দেখত না। 'ব্রাহ্ম' মানেই 'ম্লেচ্ছ'। স্কুলে ভর্তি হয়েছেন তিনি। যে বেঞ্চিতে বসতেন. কোনো হিন্দু ছেলে তাঁর পাশে বসতো না। একরাশ অভিমান বুকে বয়ে এনে বাবাকে জিজ্ঞেস করতেন, কেন এমনটা হয়? কেন ছেলেরা তাঁকে 'ম্লেচ্ছ' বলে? কী উত্তর দেবেন বাবা? উদাসীনভাবে বলতেন, 'ওসব কথায় কান দিস্ না'।

যিনি একসময় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষেব আপনজন হয়ে উঠেছিলেন,

তিনি ছোটোবেলায় কোনো প্রতিবেশী হিন্দু বাড়িতে যেতে পারতেন না! কী ধর্ম গড়ে দিয়ে গেলেন রামমোহন, যার জন্য এমন লাঞ্ছনায় পড়তে হবে? কিশোরগঞ্জে মুসলমান পরিবারের কয়েকজন ছেলে তাঁর বন্ধু হয়েছিল। এছাড়া ছিল আমেরিকান মিশনারী ও কয়েকঘর বাঙালি খ্রিস্টান পরিবার। এঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও তাঁর ভাব হয়েছে সেসময়।

কালীকিশোর ছাড়া ওই এলাকায় ব্রাহ্ম পরিবার বলতে খুব বেশি ছিল না। দুজনের কথা দেবব্রত বলেছেন। পিসতুতো দাদা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও জগমোহন বীর। জগমোহনের পুত্র শচীন্দ্র বীর দেবব্রত যে স্কুলে পড়েছেন তার ড্রয়িং টিচার ছিলেন। শচীন্দ্রবাবুর দুই মেয়ে দুই ছেলে। কাছাকাছি একটি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারও ছিল। সেই পরিবারে আলেক্উন্নেসা খাতুন নামে একজন লেডি ডাক্তার ছিলেন যিনি দেবব্রতকে খুব ভালোবাসতেন। পিসতুতো দাদা, ড্রয়িং টিচার আর লেডি ডাক্তার—এই তিন বাড়িতে দেবব্রত যখন ইচ্ছে যেতে পারতেন।

কেমন ছিলেন বাবা দেবেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস? দাদু বাবা কাকা জ্যাঠামশাই —সকলেরই নামের শেষে 'কিশোর'। একি কিশোরগঞ্জের পরিচিতি বহন করেছে? সে যাই হোক, ছেলে দেবব্রতর চোখে বাবা ছিলেন 'গোঁড়া ধরনের ব্রাহ্ম'। রাজা শশিকান্ত আচার্য ছিলেন কিশোরগঞ্জের জমিদার। তাঁরই পুত্র স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। রাজা শশিকান্ত আচার্যের যে হাতিশাল ছিল তার প্রধান ছিলেন দেবেন্দ্রকিশোর। আসলে পারিবারিক পদবি ছিল 'দে বিশ্বাস'। দেবব্রত তাঁর নামের পাশে 'দে বিশ্বাস' লিখতেন না। শুধু 'বিশ্বাস' লিখতেন। বাংলাদেশে পদবী ছেঁটেছিলেন অনেকেই। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বংশধরেরা 'চৌধুরী' বর্জন করে 'রায়' হলেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরাও তো 'রায়চৌধুরী' লিখতেন। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে পদবি লিখতেন শুধু 'রায়'।

গ্রাম বা মফস্বল শহরের খোলামেলা আবহাওয়ায় ছেলেমেয়েরা যেমন করে বড়ো হয়, দেবব্রত সেভাবেই বড়ো হয়েছেন। তবে বাড়িতে একটা রুটিন ছিল। আর ছিল মায়ের গান। মায়ের গান বলতে ব্রহ্মসংগীত। রোজ সন্ধেবেলা সবাইকে একসঙ্গে বসে মায়ের সঙ্গে গলা মেলাতে হত। কিছুক্ষণ গান হয়ে যাবার পর বাবার কাছে পড়তে বসতে হত। দেবব্রতকে বাবা অঙ্ক আর ইংরেজি পড়াতেন। ইংরেজি সে গদ্য হোক আর পদ্য হোক আগাগোড়া মুখস্থ করতে হত। বাবা খুবই ইংরেজি ভাষার ভক্ত ছিলেন। ছেলে যে খুব খুশি মনে এসব করতে চাইতেন তা অবিশ্যি নয়।

মায়ের গানের কথায় ফিরে আসি। বাংলাদেশে বড়ো অনেক গাইয়েকে বলতে দেখেছি আমরা, চারপাশে নানা মানুষের মুখে ভেসে বেড়ানো গান তাঁরা গলায় তুলে নিতেন। শচীন দেববর্মন, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ও প্রতিমা বড়ুয়া আমাদের এমন কথাই বলেছেন। শচীনকর্তা তাঁর নিজের লেখায় বলেছেন :

> '...ঘুরে বেড়াতাম গ্রামে মাঠে ঘাটে। ভাসাতাম নদীর জলে নৌকা, চাষী জেলেদের সঙ্গ—বাউল বোষ্টম ভাটিয়ালী গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতাম গান গেয়ে।...এমন কোন গ্রাম নেই বা এমন কোন নদী নেই, যেখানে আমি না ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশুনোর ফাঁকে আমি গান সংগ্রহ করতাম।'

শচীনকর্তা বলেছিলেন, মাধব আর আনোয়ার হচ্ছেন তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষার গুরু।

গোয়ালপাড়িয়া গানের সম্রাজ্ঞী প্রতিমা বড়ুয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন :

> 'আমি সারা জীবন প্রচলিত লোকগান সংগ্রহ করেই গেয়েছি। অন্য গান আর গাওয়া হয়নি। গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত লোকগানগুলি সংগ্রহ করে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছি।'

ভূপেন হাজারিকাকে প্রতিমা একবার বলেছিলেন, 'প্রকৃতিই আমার গানের উৎস, জঙ্গলই যন্ত্র আর যন্ত্রী, প্রকৃতি ও সমাজই আমার গান।'

ভাওয়াইয়া গানের কিংবদন্তী শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদ-ও ভিন্ন কথা বলেননি। ছোটোবেলা থেকে তিনি শুনেছেন চাষাভুষো মজুরদের গান। সেই গান মাতিয়ে রাখত সারা গাঁ। আব্বাসউদ্দিন পরম আগ্রহ নিয়ে সকাল থেকে রাত সেসব গান শুনেছেন। তাঁর কথায়, 'দম যেন কারও ফুরোয় না। হাল বাইতে বাইতে গান, ধানপাটের জমি নিড়াতে নিড়াতে গান।' শুনে শুনে গানের কথা ও সুর অবিকল কণ্ঠে তুলে নিতেন তিনি।

অনন্য কণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথাও আমাদের মনে পড়ে। ধনঞ্জয়ের প্রথম সঙ্গীতগুরু কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন :

> 'বাড়ির সামনে গান গেয়ে ভিক্ষে করছিল এক ভিখারী—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়েছিলাম গানটা। বলতে গেলে অজ্ঞাত অখ্যাত সেই গায়কই আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। অভাবের সংসার থেকে একমুঠো চাল, একটা পয়সা গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলাম। অনেক অনেক দিন পরে 'ক্ষুদিরাম' ছবিতে গেয়েছিলাম এই গানটা;.... প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি,

বহু অর্থ রোজগার করেছি। কিন্তু সেই ভিখারী গুরুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পারিনি।”

প্রথম তিনজন লোকগানের অমর শিল্পী। দেবব্রতর পরিচয় দুটো। প্রথম জীবনে গণসংগীতশিল্পী। দ্বিতীয় জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের সার্থক রূপকার। যে কোনো শিল্পী তখনই সার্থক হয়ে উঠেন যখন তাঁর পরিবেশনা মানুষের সদর্থক দিকগুলিকে বিকশিত করে তোলে। এই বিচারে দেবব্রত বিশ্বাস একশোভাগ সার্থক।

মায়ের কাছে গান শুনে যেমন ছোটোবেলায় গান শিখেছেন দেবব্রত, তেমনি চারপাশে মানুষজনের গাওয়া গানও তিনি যত্ন করে শুনেছেন। তাঁর নিজের কথায় :

> ...মাঝি-মাল্লাদের গান, মুসলমান রাখাল ছেলেদের গান, ভিখারীদের গানগুলি আমাদের কানে ও গলায় উঠে যেত। তাছাড়া আমাদের মা তো সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব সময়েই গুন্‌গুন্ করে গাইতেন। বাড়িতে একটি ছোট হারমোনিয়ম ছিল, সেটা বাজিয়ে রোজ সন্ধ্যায় মা ব্রহ্মসংগীতগুলি গাইতেন। শুনতে শুনতে গানগুলি আমার এবং আমার বোনদের গলায় উঠে যেত।’

দেবব্রত একবার বলেছিলেন, আমরা তো মায়ের গলায় গান শুনে শুনে গান শিখেছি। মা যে কোথায় গান শিখেছিলেন কে জানে! কতো গান! সব গানের কথা তার মনেও নেই। তবু নিজের লেখা বইয়ে যে কটি গানের তালিকা দিয়েছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। আমরা এখানে সেই তালিকাটি যোগ করব।

*ব্রহ্মসংগীত**

ভাইবোনে মিলে তব পদতলে	:	কামিনী সেন (রায়)
বলরে বলরে বলরে বল ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্	:	কালীনারায়ণ গুপ্ত
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বরবিতান-৪)
হে সখা মম হৃদয়ে রহো	:	ঐ (স্বরবিতান-৪)
তোমার অসীমে প্রাণ মন ল’য়ে	:	ঐ (স্বরবিতান-৪)
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	:	ঐ (স্বরবিতান-২২)
ভুবনেশ্বর হে	:	ঐ (স্বরবিতান-২৪)
নয় নয় এ মধুর খেলা	:	ঐ (স্বরবিতান-৪০)
তোমারি মধুর রূপে	:	ঐ (স্বরবিতান-২২)

* রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপির সূত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি গানগুলির সুর ও স্বরলিপির সূত্র ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ বইয়ে পাওয়া যাবে।

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	ঐ (স্বরবিতান-৪)
আজি যত তারা তব আকাশে	ঐ (স্বরবিতান-২২)
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে	ঐ (স্বরবিতান-৪৩)
কর তাঁর নাম গান	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাও হে তাঁহার নাম	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মোরা সত্যের 'পরে মন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বরবিতান-৫৫)
ভজরে প্রভু দেব-দেব	কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
অনন্ত অপার তোমায় কে জানে	মনোমোহন চক্রবর্তী
ভাব সেই একে	রাজা রামমোহন রায়
সীমার মাঝে অসীম তুমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বরবিতান-৩৮)
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা	ঐ (স্বরবিতান-৪)
আমার মাথা নত করে দাও	ঐ (স্বরবিতান-২৩)
চির নবীন শিব সুন্দর হে	মনোমোহন চক্রবর্তী
তুমি আমাদের পিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বরবিতান-৩৬)
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি	ঐ (স্বরবিতান-২৩)
প্রভু আমার প্রিয় আমার	ঐ (স্বরবিতান-৩৬)
প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম	মনোমোহন চক্রবর্তী
বন্দি দেব দয়াময় তব চরণে	সুমতিবালা দেবী
ব্রহ্ম নাম বদনেতে বল অবিরাম	চণ্ডীচরণ গুহ
মা গো জননী স্নেহরূপিণী	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য গান

দেবব্রত মায়ের কাছে আরও বেশ কিছু গান শিখেছিলেন। সেগুলো ব্রহ্মসংগীত ছিল না। তেমন কয়েকটি গানের কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। যেমন :

মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি (রচনা—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য)
ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে (রবীন্দ্রনাথ, 'কালমৃগয়া')
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে (রবীন্দ্রনাথ : স্বরবিতান-৫০)
বাদল-ধারা হল সারা (রবীন্দ্রনাথ : স্বরবিতান-১৫)

ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ করে প্রতিবছর ব্রাহ্মরা মাঘোৎসব পালন করেন। দেবব্রত লিখেছেন, মাঘোৎসবের সময় বাড়ির সকলে মিলে কিশোরগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে ময়মনসিংহ শহরে বড় পিসীমার বাসায় চলে যেতেন। পিসীমা যেখানে থাকতেন, সেখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্ম পরিবার ছিল। জায়গাটাকে বলা হত 'ব্রাহ্মপল্লী'। মাঘোৎসবের দিনে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে সকল ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েরা জড়ো হত। গলা মিলিয়ে সকলে নানা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন।

বড়োরাও সেখানে থাকতেন। মা অবলাদেবীও গান করতেন। ওই পল্লীতে একজন ছিলেন যিনি দেবব্রতর চেয়ে তিন বছরের বড়ো। ১৯০৮ সালে তাঁর জন্ম। ডাকনাম ছিল 'খুদু'। ভালো নাম পুলিনবিহারী সেন। ১৯২৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি এ পড়েন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও তিনি ভিন্ন ধরনের জীবিকা বেছে নেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি সম্পাদনার কাজে অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশনা বিভাগে তাঁর অবদান কারও সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদনায় তিনি আজও সমানভাবে আলোচিত হন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। ছোটোবেলায় তাঁর সঙ্গে দেবব্রতর খুব ভাব হয়। দেবব্রত তাঁকে 'খুদুদা' বলে ডাকতেন।

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রতিবছর যেমন গান হত, তেমনি বছরের অন্য ছুটির সময়ে শহর থেকে অনেকে কিশোরগঞ্জের বাড়িতে আসতেন। দেবব্রত লিখেছেন, 'আমার কাকা, কাকীমা, খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোনেরা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে মহানন্দে ছুটি উপভোগ করতাম।' আর শুধু গল্পগুজবে যে সময় কাটত তা নয়, রোজই গান বাজনা হত। এভাবে শৈশব ও কৈশোরে দেবব্রতর গানের ভান্ডার ভরে গিয়েছিল।

শুধুমাত্র 'ব্রাহ্ম' হবার অপরাধে দেবব্রত ছোটোবেলায় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যে অবহেলা পেয়েছেন, একটু বড়ো হবার পর তা অনেকটাই কমতে থাকে। সবাই যে তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা নয়। তবে বেশ কজনের কথা তিনি সারাজীবন মনে রেখেছেন। যখন তাঁর বয়স বারো-তেরো বছর, স্কুলের সব সহপাঠী তাঁকে ব্রাহ্ম বলে দূরে ঠেলে দেয়নি। কয়েকজন সহপাঠীর বাড়িতে তিনি আসা যাওয়া করতেন। তাদের বাবা মায়েরাও তাঁকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের মতোই আদর করতেন। ১৯২৫ সালে পুলিনবিহারী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। দেবব্রতর এক স্কুলের সহপাঠী ইন্দুভূষণ রায় ওই বছরেই শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে আসেন। এই ইন্দুভূষণের সঙ্গে দেবব্রতের সারা জীবন বন্ধুত্ব ছিল। পরিণত বয়সে ওঁদের একসঙ্গে তোলা একটি ছবি আমরা এই বইয়ে যোগ করেছি।

দেবব্রতর আর এক সহপাঠীর নাম ছিল 'টুনু'। ভাল নাম অমিয়। অমিয় রায়। অমিয় ভাল গান গাইতেন। সে বাড়ির সকলেই দেবব্রতকে ভালোবাসতেন

খুব। গান বাজনার রেওয়াজ ছিল সে বাড়িতে। দেবব্রত লিখেছেন, নানারকমের গান হত সে বাড়িতে। আধুনিক গানও হত। বড় হয়ে সব আধুনিক গানের কথা তাঁর মনে ছিল না। দু একটি গানের কথা লিখেছেন। যেমন :

'সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী, এই যে মোদের গোপন মিলন কেউ জানে না আমরা জানি'। আরও একটি আধুনিক গানের লাইন : 'বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।' (আঙুরবালার গান। এই গানের গীতিকার ও সুরকার ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ব্রহ্মসঙ্গীতের চেয়ে এসব গান তাঁর খারাপ লাগত না। এ তো গেল ঘরে ঘরে মুখে মুখে গাওয়া গানের কথা। রেকর্ডের গান তিনি প্রথম কখন শুনেছিলেন? তাঁর লেখা থেকেই জেনে নেওয়া যাক।

> "কিশোরগঞ্জে রমণী সাহা নামে এক ভদ্রলোকের একটি সাইকেলের দোকান ছিল। সেই দোকানে আবার তখনকার দিনের চোঙা লাগানো কুকুরের ছবি দেওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার কলও বিক্রি হত, রেকর্ডও বিক্রি করা হত। তখনকার দিনে ওই সব যন্ত্রকে বলা হত 'কলের গানের যন্ত্র'। মাঝে মাঝে রমণীবাবুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের গান শুনতাম এবং কিছু কিছু গানও গলায় তুলে নিতাম।"

বাজারে তখন যাঁদের রেকর্ড পাওয়া যেত কয়েকজনের নাম আলাদা করে বলতেহ হয়। কে মল্লিক, আশ্চর্যময়ী দাসী, বেদানা দাসী, আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী।

কে মল্লিকের জন্ম ১৮৮৮ সালে বর্ধমান জেলায়। খুব গরিব পরিবার। তাঁর আসল নাম ছিল মুনশী মহম্মদ কাসেম। ছোটোবেলা থেকেই গলায় তাঁর গান ছিল। পেটের তাগিদে কলকাতায় এসে এক দোকানে কাজ নেন। কিছুদিন পর র‍্যালি ব্রাদার্স-এ কাজ নিয়ে কানপুর চলে যান। সেখানে গান শেখেন। আবার কলকাতায় ফেরেন। তাঁর একসঙ্গে বারোটি গান জার্মান এক রেকর্ড কোম্পানি থেকে বেরোয়। তিনি বাংলা ও হিন্দি দুভাষাতেই গান রেকর্ড করেছেন। আবার ইসলামী গানও করেছেন। গায়কের 'ধর্ম' দেখে ক্রেতারা যাতে রেকর্ড কিনতে গিয়েও পিছিয়ে না আসে তাই রেকর্ড কোম্পানি একটা কায়দা করেছিল। বাংলা রেকর্ডে তাঁর নাম থাকত কে মল্লিক। হিন্দি রেকর্ডে পণ্ডিত শংকর মিশ্র। ইসলামী গানের বেলায় থাকত আসল নাম। মুনশী মহম্মদ কাসেম। প্রায় তিরিশ বছর গান রেকর্ড করেছেন। বেশির ভাগ রেকর্ডই ৩০/৪০ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। ওই জার্মান কোম্পানি ছাড়া তিনি সুপরিচিত 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-এও রেকর্ড করেন। বলতে বাধা নেই, দুটি কোম্পানিই লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে, শিল্পীর কপালে বিশেষ কিছুই জুটেনি। এই শিল্পী রজনীকান্ত,

অতুলপ্রসাদ, নজরুল এমনকী রবীন্দ্রনাথের গানও গেয়েছেন। ১৯৪০ সালের শেষে তিনি আফিমের দোকান দেন। শেষ বয়সে কে মল্লিক নিজের গ্রামে ফিরে যান। সেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষদের তিনি গান শেখাতেন।

আশ্চর্যময়ী ও বেদানা দাসীর কথা আমরা খুব বেশি জানতে পারিনি। আঙুরবালা দেবী ১৯০০ সালে বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম রেখেছিলেন প্রভাবতী। বাংলা হিন্দি ও উর্দু মিলিয়ে তাঁর মোট গানের সংখ্যা তিনশোর বেশি। তিনি ছায়াছবি ও মঞ্চে অভিনয়ও করেছেন। তাঁর অভিনীত একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের পঞ্চাশটি গান রেকর্ড করেছেন আঙুরবালা। তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড 'বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।' এই গানটির কথাই দেবব্রত আগে বলেছেন। রেকর্ডের উল্টোপিঠে ছিল 'কালা তোর তরে কদমতলায়'। পরিচালক নৃপেন বসু 'মুক্তার মুক্তি' নাটকে তাঁকে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। তারপর আঙুরবালা 'আত্মদর্শন', 'তুলসীদাস', 'সাজাহান', ব্যাপিকা বিদায়'—এমন অনেক নাটকে অভিনয় করে ইতিহাস গড়েছেন। অনেক বয়সেও তিনি বিমান মুখোপাধ্যায়ের ট্রেনিং-এ এইচ এম ভি-তে চারটি নজরুলের গান রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর গানের তালিম ছিল অটুট৷ উদাত্ত কণ্ঠস্বর। ১৯৮৪ সালে আঙুরবালা দেবী আমাদের ছেড়ে চলে যান। নজরুলের কথা বলতে আঙুরবালা খুব ভালোবাসতেন। নজরুলকে তিনি 'কাজী সাহেব' বলে ডাকতেন। একবার আঙুরবালা বলেছেন, প্রথম যেদিন নজরুলের সঙ্গে দেখা হয় তার কথা। অপেক্ষা করছেন, কখন নজরুল আসবেন। আঙুরবালা ভেবেছেন, নজরুলের নিশ্চয়ই আলখাল্লা থাকবে, দাড়ি থাকবে, মাথায় টুপি থাকবে। দেখা গেল, গায়ে তাঁর গেরুয়া পাঞ্জাবী, হলুদ সিল্কের পাগড়ি। গলায় পুঁতির মালা। যিনি নজরুলের গান গাইবেন, তার কণ্ঠস্বরের প্রকৃতির কথা ভেবে নজরুল গান লিখতেন ও সুর দিতেন। স্বরলিপি দেখিয়ে গায়ক বা গায়িকার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিতেন।

দেবব্রতর সঙ্গীত আলোচনায় এই প্রসঙ্গ খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়। আঙুরবালা বলেছেন, কাজী সাহেব গান ও স্বরলিপি হাতে দিয়ে বলতেন, 'এবার তুমি আঙুরের মিষ্টত্ব লাগিয়ে গান কর।' (www.jasimuddin.org) পরে আমরা দেখব, দেবব্রতও প্রথম নজরুলের গান রেকর্ড করেছিলেন। সেই গান মুক্তি পায়নি। পেলে হয়তো বা ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত।

ইন্দুবালা দেবী আঙরবালার চেয়ে দুবছরের বড়ো ছিলেন। ১৮৯৮ সালের নভেম্বরে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলায় আমরা সকলেই যে কবিতা পড়েছি, 'সকালে

উঠিয়া আমি মনে মনে বলি', তার রচনাকার ছিলেন মনোমোহন বসু। তাঁর দুই ছেলে মতিলাল ও প্রিয়নাথ বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সার্কাস দল তৈরি করেছিলেন। সেই দলের নাম 'বোসেস সার্কাস'। প্রিয়নাথ বসুর এই বিষয়ে একটি বইও রয়েছে। সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন রাজবালা। মতিলাল ও রাজবালার কন্যা ছিলেন ইন্দুবালা। পাঞ্জাবে জন্ম হয় ইন্দুবালার। তাঁর যখন দুবছর বয়স, বাবা মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অথৈ জলে পড়ে মা সাতবছরের ইন্দুবালাকে নিয়ে রূপোগাছির এক বাড়িতে (এখন এই জায়গাটার নাম অদ্বৈত মল্লিক লেন) এসে উঠেন। ভদ্রলোকেরা সেই এলাকাকে ভালোচোখে দেখেন না। ইন্দুবালা জীবনে অনেকবার সুযোগ পেয়েও সেই এলাকা ছেড়ে আসেননি। বলতেন, ছোটোবেলায় যাদের পাশে থেকে বড় হলাম, সুযোগ পেয়েছি বলে তাদের ছেড়ে চলে যাব? তাঁর বাড়ির সামনে লেখা ছিল 'মিস ইন্দুবালা'। বীণাপাণি পর্দাস্কুলে পড়েছেন তিনি। ভালো পড়াশুনোয়। 'জলপানি' পেয়েছেন। ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস সিক্সে ডবল প্রমোশন পেয়ে উঠেছেন। গৌরীশঙ্কর মিশিরজীর কাছে তাঁর গান শেখা শুরু হয়। ইন্দুর প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে মিশিরজী তাঁকে গহরজান বিবির কাছে নিয়ে যান। গহরজানের কাছে অনেকদিন তালিম নিয়েছেন ইন্দুবালা। ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে গান শিখেছেন। মন্তাবাবু (সেকালের নামকরা গাইয়ে এম এন ঘোষ) ইন্দুবালাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে যান। অভিনয়ে নিয়ে যান। সেকালের সকল বিখ্যাত অভিনেতা দানীবাবু, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীদের সঙ্গে ইন্দুবালা অভিনয় করেছেন। নির্বাক ও সবাক উভয় চলচ্চিত্রেই অভিনয় করেছেন। হিন্দি, উর্দু, গুজরাতি, তামিল ও তেলেগু ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখতে পাই আমরা। ১৯৩৫ সাল নাগাদ তিনি মহীশূরের রাজদরবারের গায়িকা নির্বাচিত হন। দক্ষিণী শ্রোতা। গাইতেন উত্তর ভারতের খেয়াল, ঠুংরি, গজল ও দাদরা। ওই আমলে মাসে আড়াইশো টাকা পেতেন। কলকাতা বা আর কোথাও গান গাইতে বাধা ছিল না। এগারো বছর রাজদরবারে ছিলেন। ১৯৪৬ সালে চলে আসেন কলকাতায়। আঙুরবালার মতো তিনিও অনেকদিন নজরুল ইসলামের কাছে গান শিখেছেন। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড বেরোয়। একপিঠের গান 'ওরে মাঝি তরী হেথায়।' অন্যপিঠে 'তুমি এস হে, এস হে।' আমরা দেখছি, দেবব্রত আঙুরবালার প্রথম রেকর্ডের গানের কথা যেমন বলেছেন, ইন্দুবালারও প্রথম রেকর্ডের গানের কথাই বলেছেন। বাংলা গানের সমৃদ্ধ ভান্ডারী বিমান মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সবরকম গানের ধারায়

মিলিয়ে তিনি, আজকের মান-এও একমাত্র কমপ্লিট গায়িকা। ... তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজল, নজরুলের গান, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি, নাটকের গান, কাব্যগীতি, দেহতত্ত্ব, রামপ্রসাদী প্রভৃতি সবধরনের গান শোনার সুযোগ এখন আর তেমন হয় না বলে ইন্দুবালার প্রকৃত মূল্যায়ন কেমন যেন গুলিয়ে যায়।'

ইন্দুবালার চলে যাওয়ার দিন ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪। সেদিন সকালেই চলে গিয়েছেন বিশিষ্ট তবলাশিল্পী রাধাকান্ত নন্দী। ১৯৮৪ সালের শুরুতে আঙুরবালার প্রয়াণে বাংলার সঙ্গীতসমাজ শূন্যতা অনুভব করেছিল। আঙুরবালার চলে যাওয়ার দিন ছিল ৭ই জানুয়ারি ১৯৮৪। ইন্দুবালা দেবীর স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ রয়েছে তাঁরই লেখা একটি কবিতা। এই কবিতাকে গান হিসাবে প্রথম রেকর্ড করেন আঙুরবালা দেবী। তারপর শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। কী সেই কবিতা?

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান, পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান,
পাপী পুণ্যবান, মূর্খ কি বিদ্বান, সমান ভাবে হেথা সকলে শয়ান।
কন্দর্প সমান রূপের অধিকারী, সৎজন, তস্কর, গৃহী, বনচারী,
রাজা আর ভিখারী সকলে সমান।
শ্মশানমাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম, সুখ-দুঃখ শ্রান্তির চির অবসান।
হেন মহাতীর্থে, আতিথ্য গ্রহণ, যদিরে অধম, চায় তোর মন
সময়মত পেলে, মৃত্যুর দরশন—সখা, বলে তারে তুমি করো আলিঙ্গন।

আঙুরবালা ও ইন্দুবালার গানের রেকর্ড আজকাল সহজলভ্য না হলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। কলকাতা শহরে ব্যক্তিগত সংগ্রাহক কয়েকজন রয়েছেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনেও একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে।

সঙ্গীতভবনের সংগ্রহশালায় পুরোনোকাল থেকে শুরু করে সমকালীন শিল্পীদের একাধিক রেকর্ড যত্ন করে সংরক্ষিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান তো রয়েছেই। এছাড়া রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কে মল্লিক, লালচাঁদ বড়াল, তামিল হোসেন, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী, হরিমতী দেবী, মাণিকমালা দেবী, মানদাসুন্দরী দেবী, নীহারবালা দেবী, বিনোদিনী দাসী, বেদানা দাসী, গহরজান বিবি ও আশ্চর্যময়ী দাসীর গান। ইন্দুবালা তাঁর আত্মকথা লিখতে শুরু করেছিলেন। শেষ করে যেতে পারেননি। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত সাধ্যমত তাকে সম্পূর্ণ করেছেন।

কে মল্লিক, আঙুরবালা ও ইন্দুবালার গানের যে আকর্ষণী শক্তি তা কিশোর

দেবব্রতকে আবিষ্ট করেছিল। ভালো লাগা গানই তো মানুষ গুনগুন করে গায়। নিজের গলায় তুলে নেয়। অথচ মজা এই, দেবব্রতকে এই গান গাইতে শুনলে বাবা মা দুজনই তাঁকে বকুনি দিতেন। বলতেন, 'কী ছাতামাতা গান গাস? রবিববুর গান গাইতে পারিস না?' দেবব্রত বকুনি খেয়ে ওসব গান গাওয়া যে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নয়, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে নিরাপদ (!) জায়গায় গিয়ে গাইতেন।

একথা আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীতে দুই প্রজন্মের মধ্যে একটা দূরত্ব দেখা যায়। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের বেলায় অনেক সময়েই সে দূরত্ব চোখে পড়ে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই থাকে। তবে তা ব্যতিক্রমই। দেবব্রত যেখানে সকলরকম সঙ্গীতের সুর আস্বাদন করতে চাইছেন, ব্রহ্মসঙ্গীতে নিবিষ্ট বাবা-মা ছেলেকে সে জগতের বাইরে যেতে দিতে চাইছেন না। আজ ভাবতে বিস্ময় জাগে, বিখ্যাত নীরোদ সি চৌধুরীর মা রবিবাবুর গান গাইতেন বলে প্রতিবেশী হিন্দুরা তার নিন্দা করতেন। ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের ওই সময়ের ভেদাভেদ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকেও যেন কেমন 'একপেশে' করে তুলেছিল। সে ভাবনা যে সারবত্তাহীন, সময় তা প্রমাণ করেছে।

পৃথিবীর সকল মানুষ জাতপাত ধর্ম মানেন না। কাকে বলে মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কজন মানুষ এমন নিবিড়ভাবে বলতে পেরেছেন? তবু ঘটনা এই, তাঁর ব্রাহ্ম পরিচিতি একসময় মানুষের ঔদার্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের বেলায় সে পরিহাস আরও বেশি তীব্রতর। ব্রাহ্ম সমাজের একদল যখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নোবেল লাভের পর আরও বেশি 'কাছের মানুষ' হিসেবে পেতে চাইছেন, অন্য দল এতে ঘোর আপত্তির কথা জানিয়েছেন। সুকুমার আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের লেখা 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' তো আজ ইতিহাস হয়ে গিয়েছে।

কিশোরগঞ্জের বেশির ভাগ অব্রাহ্ম হিন্দু পরিবারে দেবব্রত যে 'অস্পৃশ্য' ছিলেন, একথা তিনি ভুলতে পারেননি। কোনো মানুষই পারেন না। তবে সেই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করেন তখনই, যখন নিজে এসব সংকীর্ণ ও কুরুচিকর ভাবনা থেকে শতযোজন দূরে থাকেন। দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন ছিল তাই। দৃঢ় আদর্শে গড়া। মানবিকতায় পরিপূর্ণ। তার পরিচয় আমার ধীরে ধীরে রাখব।

যে সময়ে স্কুলে পড়ছেন দেবব্রত, সারা দেশ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল চেহারা নিয়েছে। কিশোরগঞ্জে সেই আন্দোলনের ঢেউ অনেকটাই পৌঁছেছিল। সেখানে কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা কংগ্রেস করতেন। স্বাধীনতার কথা

বলে মানুষকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতেন। দেবব্রত দেখেছেন, ওই সব সভাসমিতিতে নানা স্বদেশী গান গাওয়া হত।

অমিয় রায় (টুনু) শিল্পীর বন্ধু ছিলেন। তিনি ভালো গাইতেন। সে বাড়িতে মহেন্দ্র রায় বলে একজন বেশি বয়সী মানুষ ছিলেন। তাঁর গানেরও খুব ভালো গলা ছিল। স্কুলে পড়ার সময় মহেন্দ্র রায় দেবব্রত, অমিয় ও আরও কয়েক বন্ধুকে দেশাত্মবোধক বেশ কিছু গান শিখিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' তিনি ওই বয়সেই শিখেছেন। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের বেশ কয়েকটি গানও চমৎকারভাবে তিনি গলায় তুলে নিয়েছিলেন। অনেক পরে 'ভুলি নাই' ছবিতে যখন দেবব্রত মুকুন্দ দাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাঁর ওই সঙ্গীত শিক্ষা কাজে লেগেছে। যেখানেই স্বদেশী সভার খবর পাচ্ছেন, দেবব্রত সেখানেই চলে যাচ্ছেন। দরাজ গলা। তারিফ পেতেন খুব। সুযোগও পেতেন গান গাইবার। স্বদেশী গান। সভা শেষ হতে দেরি হত। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। এসব দেখে বাবার মনে সন্দেহ দেখা দিল। একদিন দেবব্রতকে ডাকলেন তিনি।

—দেরি করে ফিরছিস বাড়িতে। কি করিস? বাবাকে তো মিথ্যে বলা যায় না। বললেন তিনি, 'স্বদেশী সভায় যাচ্ছি। গান গাইছি।'

বাবার ইংরেজ শাসন বিষয়ে একটা ভিন্ন মত ছিল। ইংরেজদের যে তিনি মনে প্রাণে শাসক হিসেবে দেখতে চাইতেন, তা নয়। তবে তাঁর মনে হত, ভারতীয়রা এখনও এদেশে স্বাধীনতা প্রতিপালনের যোগ্য হয়ে উঠেনি। অনেকের 'প্রতিবাদ' তাঁর কাছে 'মিথ্যা আস্ফালন' মনে হত। সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি একচোখে দেখতেন না। দেবব্রতকে বাবা বলেছিলেন, ইংরেজরা না এলে এদেশের অনেক কুসংস্কার দূর হত না। ইংরেজ যেখানেই কংগ্রেসের নেতাদের হাতে শাসনের ভার দিয়েছে, টাকা পয়সার নয় ছয় হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একবার সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) কিশোরগঞ্জে এসেছিলেন। ১৯১৫ সালে সরোজিনী রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে দলের সভানেত্রী হয়েছেন। তখন দেবব্রত স্কুলের ছাত্র। বাবা দেখলেন, পুলিশের ভয়ে কেউই সরোজিনীকে তাদের বাড়িতে রাখতে রাজি হচ্ছে না। বাবা দেবেন্দ্রকিশোর তখন সরোজিনী দেবীকে তাঁদের বাড়িতে রাখেন। এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, বাবা প্রকৃত বিচারে, মুক্ত স্বদেশ-ই চাইতেন। তবে চাইতেন আরও একটা জিনিস। ভারতের মানুষ আগে স্বাধীন দেশ শাসন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করুক। সরোজিনী নাইডুর এক

ভাই ছিলেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা গান পরে দেবব্রত গেয়েছেন। সে কী গান! শিল্পীর বিষয়ে হারীন্দ্রনাথের একটি লেখাও এই বইয়ে যোগ হয়েছে।

বাবা দেবেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকান্ড দেখে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনা দেবেন্দ্রকিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করে। মহাত্মা গান্ধী বিষয়ে বাবার কী অভিমত ছিল তা সরাসরি না জানলেও একটি কথা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। বাবা বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কেন যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা বলতেন আমি বুঝি না'। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতাদের সংগঠিত প্রতিবাদে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বড়োরা জানেন, গান্ধিজী সেই ডাকে সাড়া দেননি। কলকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় একা প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে। হতে পারে, দেবেন্দ্রকিশোর গান্ধিজীর সে সময়কার প্রতিক্রিয়া ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেননি। আগেই বলেছি, কেউ ব্রাহ্ম হলেই তার 'সাত খুন মাফ', এমন ধারণায় দেবব্রতর সমর্থন ছিল না। রেবা রায় যখন রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নৃত্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন সমালোচনার ঝড় থেকে শুধু রেবা রায় নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রেহাই পাননি। রেবা ছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। মেয়েরা মঞ্চে নাচবে, ব্রাহ্মদের বেশিরভাগ তা সমর্থন করেননি। কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) তখন ছিলেন 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। এই পত্রিকা সেসময় অনেক সামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতনের কাহিনি প্রকাশ করেছে। মেয়েদের মঞ্চে নৃত্য প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করেনি। দেবব্রতর মা বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা কৃষ্ণকুমারের অভিমত সমর্থন করেননি। অনেকেই জানেন, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ আজীবন মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। ১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথ প্রয়াত হন। নইলে 'সঞ্জীবনী' এমন ভূমিকা সেদিন গ্রহণ করতে পারত না বলেই মনে হয়। দেবেন্দ্রকিশোর নিয়মিত বাড়িতে 'মৌচাক', 'সন্দেশ' ও 'সঞ্জীবনী' রাখতেন। প্রথম দুটো যে ছোটোদের দুই সেরা কাগজ, একথা আমরা সকলেই জানি।

দেবব্রত ১৯২৭ সালে কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৮৮১ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গণিতে

ও অ্যাডিশনাল সংস্কৃতে তিনি লেটার মার্কস পান। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ম্যাট্রিকের মার্কশীট সংগ্রহ করেছি যা এখানে যোগ করা হল।

UNIVERSITY OF CALCUTTA

Matriculation Examination Year: 1927

Name: BISWAS DEBABRATA.

Roll & No: Kish. No.79

Age on 1st March –1927 - 15 years. 6 Months

Statement of Marks Obtained

	English			Mathematics	Classical Language	Vernacular Language	Additional		Total	Division
	I	II	Total				Mathematics	Classical Language		
Full Marks	100	100		100	100	100	100	100	700	
Marks obt.	56	62	118	85	71	50	70	85	479	I

Assit Controller of Examinations

30.03.11
Controller of Examinations
Controller of Examinations (Actg.)
University of Calcutta

শিল্পীর ম্যাট্রিক পরীক্ষার মার্কশীট

কলকাতার জীবন : প্রথম ভাগ

ম্যাট্রিক পাশ করে দেবব্রত ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। তাঁর যে বড়ো পিসীমার বাড়ি ছিল ময়মনসিংহের ব্রাহ্মপল্লীতে, সেখানে তিনি থাকতেন। ১৮৭৮ সালে আনন্দমোহন বসু কলকাতায় সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জন্মস্থান ময়মনসিংহ। ১৮৮৩ সালে ময়মনসিংহে নিজের বাড়িতেই তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুল তৈরি করেছিলেন। ১৯০১ সালে স্কুলের কলেজ বিভাগ চালু হয়। ১৯০৮ সালে তাঁর বাড়ি থেকে কলেজটি নতুন জায়গায় উঠে আসে। ১৯৬৪ সালে এর নাম হয় আনন্দমোহন কলেজ। দেবব্রত যখন ছাত্র ছিলেন, এর নাম সিটি কলেজিয়েট স্কুল-ই ছিল। প্রায় সাড়ে পনেরো একর জায়গা জুড়ে কলেজটি রয়েছে। এখন এটি আর কলেজ নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এর আচার্য পদে কাজ পরিচালনা করেন। কলেজের বিখ্যাত ছাত্রদের তালিকায় ওয়েবসাইটে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন নীহাররঞ্জন রায়, ম্যাজিসিয়ান পি. সি. সরকার, সৈয়দ ওয়ালিওল্লাহ ও নির্মলেন্দু গুণ।

তবে যাই হোক, এই কলেজে দেবব্রত বেশিদিন পড়াশুনো করার সুযোগ পাননি। কলকাতার সিটি কলেজে সে সময় ভীষণ গন্ডগোল। সবে মাত্র কয়েক বছর হল কলেজটি তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত কলেজ। পাশেই রামমোহন ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের হিন্দু ছাত্ররা দাবি করলেন, সরস্বতী পুজো করবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজি নন।

ব্রাহ্মরা মূর্তির আরাধনায় বিশ্বাস করেন না। বহু ঈশ্বরেও তাদের আস্থা নেই। বিরোধিতা এমন জায়গায় গেল যে রাজনৈতিক নেতারাও এতে জড়িয়ে পড়লেন। কলকাতার এক সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা হিন্দু ছাত্রদের কাছে আবেদন করলেন, 'ওরা পুজো করতে দেবে না। কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। কলকাতায় কলেজের অভাব নেই।'

দলে দলে ছেলেরা কলেজ ছেড়ে দিতে লাগল। রামমোহন ছাত্রাবাস ফাঁকা। কলেজও বন্ধ হবার মুখে। ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমণিরা বৈঠকে বসে ঠিক করলেন, ব্রাহ্মদের কাছে আবেদন জানানো হবে, কলেজ পড়ুয়া কেউ থাকলে যেন তাকে সিটি কলেজে পড়তে পাঠানো হয়।

সেই আবেদন দেবেন্দ্রকিশোরের কাছেও এল। এই আবেদনে তিনি সাড়া দিলেন। দেবব্রতকে বললেন, 'ময়মনসিংহেব কলেজ ছেড়ে দাও। কলকাতায় গিয়ে সিটি কলেজে ভর্তি হও।'

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কলকাতা তার চেয়ে অনেকটা দূরে। তবু দেবব্রত বাড়ির বাইরেই থাকছিলেন। দেবব্রত লিখেছেন, ১৯২৭ সালের শেষ দিকে বা ১৯২৮ সালের গোড়ায় তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। রামমোহন ছাত্রাবাসে থাকতেন না তিনি। কলেজের ঠিকানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ৪৩ নম্বর বাড়িতে 'অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল।' কলেজ থেকে পায়ে হাঁটা পথ। সেই হোস্টেলে একটি ঘর নিলেন দেবব্রত। তখন থাকা খাওয়া ও একবেলা টিফিনের খরচ ছিল মাসে একুশটাকা।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সুবিখ্যাত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭-১৯৩৮)। যদিও দেবব্রত বিস্তৃতভাবে বলেননি, তিনি লিখেছেন, 'সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম।'

হেরম্বচন্দ্র ছিলেন সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজি পড়াতেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার তিনিও ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারে তিনি একাধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর কন্যা নির্মলকুমারী মহলানবীশ বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্রের সহধর্মিনী ছিলেন।

ব্রাহ্ম পরিবারের সদস্য দেবব্রত। ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে ব্রাহ্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই কলকাতায় তাঁর আগমন। কাছেই ছিল ব্রাহ্মসমাজ মন্দির : ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। দেবব্রত নিজেই লিখেছেন, এর আবার তিনভাগ। আদি ব্রাহ্মসমাজ। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রথমটি দেবেন্দ্রনাথের। দ্বিতীয়টি কেশবচন্দ্রের। এর বাইরের ব্যক্তিদের 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। ভবানীপুরে আরও একটা ছিল। 'ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ'। দেবব্রত ২১১ নম্বর ঠিকানায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে যেতেন। ভবানীপুরের মন্দিরে যেতেন। তাঁর কোনো বাছবিচার ছিল না।

কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে মানুষটির জীবনযাপন, তিনি ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের সভায় প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম পরিবারেরই তো একজন। মায়ের মুখে 'রবিবাবুর গান' শুনেছেন। ব্রাহ্মসমাজেও অনেকদিন তাঁর গান এই নামেই পরিচিত ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে '১৯২৮' একটি বিশেষ বছর। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

শতবর্ষ। শতবর্ষের উপাসনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে আচার্য হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সত্তর প্রায় ছুঁয়েছে তখন তাঁর বয়স। শরীর ভালো ছিল না। সেদিন প্রচুর জনসমাগম ছিল। ভীড় ঠেলে রবীন্দ্রনাথকে আসনে বসানো হয়। দুর্বল তাঁর কণ্ঠস্বর। সভার শেষে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার স্মৃতি কারও পক্ষেই ভুলে যাওয়া সহজ নয়। দেবব্রতর তো নয়-ই। এই দিনটির কথা দেবব্রত যখন লিখেছেন, তাঁর একটি ভিন্ন ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। দেবব্রত জানেন, রেবা রায়ের নাচের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেক মাথা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভালো মনে সে জিনিস নেননি। ব্রাহ্মমন্দিরের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাই কিশোর দেবব্রত সবকিছু মেলাতে পারছিলেন না। পরে যতো বয়স বেড়েছে, দেবব্রত বুঝেছেন, সকলের মেলানোর হিসেব এক রকম হয় না। রবীন্দ্রনাথের তো কখন-ই নয়।

১৯২৯ সালে সিটি কলেজ থেকে দেবব্রত আই. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। বি. এ. পড়তে ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। থাকার জায়গারও বদল হল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের খুব কাছাকাছি ভুবনমোহন সরকার লেনে থাকতেন। সেখানে একটা মেসবাড়ি ছিল। নাম 'ব্রাহ্ম ইয়ংমেন্‌স হোম'। বেশিদিন দেবব্রত এই মেসে থাকেননি। ১৯৩০ সালের শেষদিকে মার্কাস স্কোয়ারের কছে বালক দত্ত লেনের এক মেসবাড়িতে তিনি উঠে আসেন। সেখান থেকে কলেজ বেশি দূরে ছিল না।

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম নাম ছিল 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'। ১৮৭২ সালের ২৫শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক জে. সুটক্লিফের কাছে একটি আবেদনপত্র জমা পড়ে। সেখানে বলা হয়, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে 'ফার্স্ট আর্টস' ক্লাস খোলার অনুমতি দেওয়া হোক। আবেদনপত্রে সই করেন রমানাথ ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিদ্যাসাগর মশাইতো ছিলেন-ই। আবেদনকারীগণ ইংরেজি, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে যোগ্য অধ্যাপক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুদিন পর ১৮৭২ সালের ২৭শে জানুয়ারি, বিদ্যাসাগর সে সময়কার উপাচার্য এডওয়ার্ড ক্লাইভ ব্যালির কাছে একই বিষয়ে একটি আলাদা চিঠি লেখেন।। তিনি কথা দেন, উপযুক্ত 'নেটিভ' শিক্ষকদের-ই নিয়োগ করবেন। বিদ্যাসাগর আরও লিখলেন, বেশি মাইনে দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সকলে পড়তে পারবেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এফ. এ. পড়াবার অনুমতি দেয়। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এফ. এ. পড়ানো শুরু হয়। মাস মাইনে ছিল তিন টাকা। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাবু শশীভূষণ ভাদুড়ি, বাবু বৈদ্যনাথ বসু, বাবু অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, বাবু চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তখন একটা কথা মুখে মুখে প্রচারিত ছিল যে 'নেটিভ' মাস্টারমশাইরা কখনো ভালো পড়াতে পারবেন না। যাচাইয়ের দরকার নেই কোনো। বেশিরভাগ ছাত্র ঠিক করলেন, কলেজ ছেড়ে চলে যাবেন। কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে যায়। তিনি একদিন সকল ছেলেদের ডেকে বলেন, ওরা না থাকলে কলেজ তিনি বন্ধ করে দেবেন। ছেলেরা তখন উত্তরে জানান, ওরা কলেজ ছেড়ে যাবেন না।

শুরুতে কেমন ফল করেছিল এই কলেজ? ১৮৭৪ সালে প্রথম এফ. এ. পরীক্ষায় বসেন ছাত্ররা। যোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। নিবন্ধক কলেজের ফল দেখে বলেছিলেন, 'পন্ডিত আমাদের অবাক করেছেন।'

১৮৭৯ সাল থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. পড়ানো শুরু হয়। বি. এ. পরীক্ষার ফল কেমন হত সেখানে? ১৮৮২-৮৩ সালের রিপোর্টে সে সময়কার ডি পি আই লিখলেন :

'বি. এ. পরীক্ষায় সরকারি কলেজের ছাত্ররা শতকরা ৪৩.৮ ভাগ পাশ করেছে। পোষিত কলেজে পাশের হার শতকরা ৪০ভাগ। কোনো অনুদান না পেয়েও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে শতকরা ৪৫.৮ ভাগ ছাত্র পাশ করেছিল।'

১৮৮৫ সালে উত্তর কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে এক বিঘা এগারো কাঠা জমি কেনা হয়। বাড়ি তৈরি হয় সেখানে। জমির দাম ছিল সাতাশ হাজার টাকা। ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের কাছে জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নেন বিদ্যাসাগর। ধীরে ধীরে কলেজের আয় থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), কলেজের বাড়ি তৈরি করতে দেড়লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছিল।

১৮৮৪ সালে সিটি কলেজে বি. এ. ক্লাস শুরু হয়েছিল। ১৮৮৪ সালেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপন কলেজ তৈরি করেন। ১৮৮৭ সালে গিরিশচন্দ্র বসু তৈরি করেন বঙ্গবাসী কলেজ। একসময় সফলতার বিচারে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রেসিডেন্সি কলেজকেও ছাড়িয়ে যায়। ডি পি আই ১৮৮৮ সালের

ফলাফলের বিচারে সেকথা উল্লেখ করেছেন। একসময় দেখা গেল, এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রেসিডেন্সির ছাত্রসংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ছাত্রপিছু খরচ কেমন ছিল তখন? ১৮৮৮ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রপিছু খরচ হত ৩৬৪ টাকা। মেট্রোপলিটন কলেজে মাত্র ৪৯ টাকা তেরো আনা। বিশিষ্ট সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তো বলেই ফেললেন, 'প্রেসিডেন্সির চেয়ে মেট্রোপলিটন কলেজ দেশের বেশি উপকার করছে।' (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর : ইন্দ্র মিত্র)। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সূর্যকুমার অধিকারী। কলেজের প্রাক্তন ছাত্রতালিকা ঈর্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য যদুনাথ সরকার কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। বেঁচে থাকতে বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, একটি এডুকেশন সোসাইটি তৈরি করতে, যাঁরা এই কলেজের দেখাশুনো কবখেন। কারা থাকবেন এতে, তা-ও তিনি ভেবেছিলেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বসু , বাবু গোলাপচন্দ্র সরকার, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বসু ও বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৯৩ সালের ১৯শে জুন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটি গঠনতন্ত্র তৈরি হল। ১৮৯৬ সালে আমরা এই কলেজে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাই সারদারঞ্জন রায়কে সহ-অধ্যক্ষ পদে দেখতে পেয়েছি। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। এই সময় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও অধ্যাপনায় যোগ দেন। সারদারঞ্জন কিছুকাল পর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তাঁর ভাই মুক্তিদারঞ্জন রায় কলেজে গণিতবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৯৬ সালে কলেজের ফার্স্ট আর্টস পাঠক্রমে ও ১৯০০ সালে বি. এ. পাঠক্রমে বিজ্ঞান চালু হল। ১৯০২ সালে এই কলেজেই বিখ্যাত 'ডন সোসাইটি' তৈরি হয়। ১৯০৭ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড' বিজ্ঞানের পরিকাঠামো তৈরি করে দেয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, একাজে সহায়তা করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অনেকের সম্মিলিত পরিশ্রমে কলেজের উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯১৭ সালে 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে এর নতুন পরিচিতি গড়ে উঠে। ১৯২৩ সালে কলেজের এলাকা প্রসারের জন্য নতুন জায়গা নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। কমিটির সদস্যদের নাম আমাদের বিস্মিত করে।

ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
রাজা হৃষীকেশ লাহা
কৈলাসচন্দ্র বসু
স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা
জি. ডি. বিড়লা
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
কিরণচন্দ্র দে, আই সি এস
জে. এন. গুপ্ত, আই সি এস
ডি. এন. লাহা, আই সি এস

কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে পড়ান। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে পাঁচশো টাকা দান করেন। যে কথা বলতেই হয়, ১৯২৫ সালে কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অর্থনীতিতে সাম্মানিক পাঠক্রম চালু হয়েছিল। দেবব্রত ১৯২৯ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন সেই বিভাগের মাত্র চার বছর পার হয়েছে। দেবব্রত যখন ছাত্র, তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩১ সালে প্রথম এই কলেজে মেয়েদের ভর্তি চালু হয়েছিল। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর কলেজের নানা বিভাগে ছাত্রদের নিয়ে সোসাইটি তৈরি হয়। আমরা অর্থনীতি বিভাগের কথাই বলব। ১৯২৪ সালে 'ইকোনমিক সোসাইটি' তৈরি হয়েছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিনোদচন্দ্র সেন। চল্লিশের দশকে কলকাতা শহর জুড়ে যে প্রগতিশীল সংস্কৃতির তীব্র হাওয়া বইছিল, বিদ্যাসাগর কলেজের একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে তা অনুমান করা যায়। ১৯৪০ সালে 'স্টুডেন্টস কমিটি' যে সম্মেলনের আয়োজন করে সেখানে আলোচক ছিলেন গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, সুধী প্রধান, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এঁদের কারও পরিচিতিই দেওয়ার দরকার পড়ে না।

১৯২৯ থেকে ১৯৩১—এই তিন বছর দেবব্রত বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েছেন। সে সময় কলেজের ছাত্ররা যে নাটক করেছিলেন তার তালিকা এরকম :

কর্ণার্জুন (১৯২৯)
মন্ত্রশক্তি (১৯৩১)

বিবাহবিভ্রাট (১৯৩১)
মানময়ী গার্লস স্কুল (১৯৩৩)

বিদ্যাসাগর কলেজের শতবর্ষ স্মরণিকায় লেখা হয়েছে, ১৯২৩ সালের আগে ছাত্রদের ভালোমন্দের কোনোরকম নথি কলেজে পাওয়া যায়নি। তারপরের ইতিহাস কেউ অনুসন্ধান করতে চাইলে কম বেশি সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় তিনজন ছাত্রের সঙ্গে দেবব্রতর পরিচয় হয়েছিল। এঁদের নাম শৈলেশ দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। ভীষ্মদেব বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজের শতবর্ষ স্মরণিকায় ভীষ্মদেবের নাম রয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে ভীষ্মদেব এক অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা আধুনিক গানের জগতে শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও হিমাংশু দত্তের অবদান মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। বিমান মুখোপাধ্যায়ের কথায় শৈলেশ ও হিমাংশু তিরিশের দশকের 'দুর্দান্ত মিউজিক ডিরেক্টর'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো চিরজীবী শিল্পীর কথা বলতে গেলেই শৈলেশ দত্তগুপ্তের কথা মনে পড়ে। তখন হেমন্তের বয়স ষোলো বছর। সেনোলা কোম্পানিতে রেকর্ডের আশায় গিয়েছিলেন। তারা রাজি হলেন না। মেগাফোন কোম্পানিতে রেকর্ড দূরে থাক, তারা তাঁর গলা শুনতেই রাজি হল না। আশাহত হয়ে কলম্বিয়াতে যান হেমন্ত। সেখানে তখন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে শৈলেশ রয়েছেন। হেমন্তকে দেখেই তাঁর ভালো লেগে যায়। হেমন্তের গান শুনেন তিনি। রেকর্ড কোম্পানিকে রেকর্ডের সুপারিশ করেন। সতেরো বছর বয়েসে, ১৯৩৭ সালে, শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড বেরোয়। একপিঠের গান 'জানিতে যদিগো তুমি'। অন্যপিঠে 'বল গো বল মোরে'। কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় রেকর্ড বেরোয়। একপিঠের গান 'তোমারে চাহিয়া প্রিয়'। অন্যপিঠে 'তুমি যে সুদূর চাঁদ কুয়াশা ছাঁওয়া'। শৈলেশ দত্তগুপ্তেব কাছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করার বেলাতেও শৈলেশ দত্তগুপ্তই তাঁকে সহায়তা করেছেন। ১৯৪৪ সালে কলম্বিয়া রেকর্ড থেকেই তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত বেরোয়। গান দুটি ছিল, 'আমার আর হবে না দেরী', ও 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'। বহু জনপ্রিয় গানের সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত। সে সব তালিকায় আমরা যাব না।

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত আমাদের সকলের কাছেই এক পরিচিত নাম। ১৯০৮ সালে জন্ম তাঁর। দেবব্রতর চেয়ে তিন বছরের বড়ো। ১৯৪৪ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেও পড়া শেষ

করতে পারেননি। ১৯৩০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে ফোর্থ ইয়ারে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রধানত তিনি সুবোধ পুরকায়স্থ ও অজয় ভট্টাচার্যের কথায় সুর দান করেছেন।

বিদ্যাসাগর কলেজে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় দেবব্রতর দুবছর আগে ভর্তি হয়েছিলেন। শরীর ভালো না থাকায় আই. এ. পড়ার সময় তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি তাঁকে দিয়ে নিধুবাবুর দুটো গান রেকর্ড করায় যা অমর হয়ে রয়েছে। গান দুটি হল 'এত কি চাতুরী সহে প্রাণ' ও 'সখি কি করে লোকের কথায়'। এছাড়া ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সত্যি বলতে কী, সামান্যতম সঙ্গীতরসিক বাঙালিও শৈলেশ দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অবদান কম বেশি জানেন।

এবার আমরা ফিরে যাই দেবব্রতর কথায়। হিমাংশু দত্তকে দেবব্রতর খুব পছন্দ হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের একটি দোতলার ঘরে থাকতেন হিমাংশু। দেবব্রত প্রায়ই সেখানে যেতেন। দেবব্রতর কথায়, তাঁর গলার কাজ খুব পরিষ্কার, কণ্ঠ শ্রুতিমধুর, সুর দিতেন নতুন রকম। এমন সুর যা দেবব্রত আগে কখনও শোনেননি। নিজের স্মৃতিকথায় সে কথা লিখতে সংকোচবোধ করেননি। আশ্চর্য, দেবব্রত তাঁর কাছে তেমন গান অনেকগুলি শিখেছিলেন। খুব যত্ন করে শিখিয়েছেন হিমাংশু। তবে দেবব্রতের মনে হত, কখনও কারও কাছে গানের তালিম নেননি বলে তিনি ওইসব সূক্ষ্ম সুর গলায় তুলতে পারতেন না। ভীষ্মদেবের সঙ্গে দেবব্রতর পরিচয় হলেও বন্ধুত্ব গভীর হয়নি। দুজনের জীবনপ্রণালীর ছন্দে মিল ছিল না। একজন জনতার মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। ভীষ্মদেব নিজের মতো করে একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে বন্ধুটির সঙ্গে দেবব্রতর নিবিড়তম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাঁর নাম সন্তোষ সেনগুপ্ত। ঢাকা বিক্রমপুরে ১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম। সে হিসেবে দেবব্রতর চেয়ে দুবছরের বড়ো। তিনি কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েননি। স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। বালক দত্ত লেনের এক মেসে একই ঘরে থাকতেন বলে পরিচয় হয়েছিল। সন্তোষ সেনগুপ্ত ছিলেন সত্যিকারের একজন সঙ্গীত শিক্ষক। আকাশবাণীতে গান শিখিয়েছেন। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ' ও 'কলম্বিয়া রেকর্ডস' এ অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন। তাঁর পরিচালনায় গ্রামোফোন ডিস্কে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শাপমোচন', 'শ্যামা', 'বাল্মীকি প্রতিভা' বেরিয়েছে। দেবকী বসুর ছবি 'চিরকুমার সভা'র সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তিনি

বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে প্রথম পুরুষ পঙ্কজকুমার মল্লিক ও দ্বিতীয় পুরুষ দেবব্রত বিশ্বাস। একজন পরম বৈষ্ণব—অন্যজন নাস্তিক।'

জর্জ বিশ্বাসের গান বন্ধ হবার পর যে কজন মানুষ সোচ্চার হয়েছিলেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর কথায়, পঙ্কজ মল্লিক চলে যাওয়ার পর রইলেন দুইজন, দেবব্রত বিশ্বাস আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'জর্জ একজন বড় শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। গান নিয়ে একজন শিল্পীর যতখানি পড়াশুনা করা প্রয়োজন, জর্জ তার থেকে বেশি পড়াশুনা করতেন।'

একটা কথা এখানে আমাদের বলতেই হয়। বাংলা আধুনিক গানের সেরা দুই স্রষ্টা শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও হিমাংশু দত্তকে কাছে পেয়েছিলেন দেবব্রত। আধুনিক গান চর্চাও করেছিলেন। তবে সেই গানে নিজেকে থিতু করেননি। প্রথমে 'ব্রহ্মসঙ্গীত', পরে 'রবিবাবুর গান' তারপর দিগন্তপ্রসারী 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' তাঁর জগৎ ও জীবন গড়ে তুলেছে। মাঝে একটা বড়ো অধ্যায় আছে। গণনাট্যের সাড়া জাগানো গান। সে অধ্যায়কে আড়ালে রেখে শিল্পী দেবব্রতকে যিনি বুঝতে চাইবেন, একটা খণ্ডিত চেহারা তার কাছে ধরা পড়বে। আধুনিক গান কি তিনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন? জনসমক্ষে হয়তো গাইতেন না। গাইতে যে পারতেন অসাধারণ, তার প্রমাণ পরিচিতজনদের কাছে জানতে পারা যায়। আনুমানিক ১৯৬৫ সাল। ড. পার্থ ঘোষ 'দরবারী'র পক্ষ থেকে দেবব্রতকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছেন। দেবব্রত বললেন, 'না, আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গামু না, আধুনিক কন তো গাইতে পারি।' মাথা চুলকে পার্থবাবু বললেন, 'আধুনিক গানের অনুষ্ঠান হবে না, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান...।' জর্জদা হঠাৎ এক কাণ্ড করলেন। হারমোনিয়াম এনে গাইতে শুরু করলেন, 'যদি কিছু আমারে শুধাও/ কি যে তোমারে কব...'। পুরোটা গাইলেন। পার্থবাবু লিখেছেন, ওরকম গান তো আগে কোনোদিন শুনিনি। গানটা শেষ করে শিল্পী বললেন—'সলিলরে কত কইর‍্যা কইলাম, গানটা আমারে দ্যান্—দিলো গিয়া শ্যামলবাবুরে...।' সকলেই জানেন, শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে এটি একটি বিখ্যাত গান।

অবিভক্ত বাংলার নানা জেলা থেকে কলকাতা শহরে বহুকাল ধরেই নানা বাড়ির ছেলেরা পড়াশুনো করতে আসতেন। জগদীশচন্দ্র এসেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এসেছিলেন। এমন তালিকা বেশ লম্বা। দেবব্রত কলকাতায় তেমনভাবে আসেননি। এক ভিন্ন বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। নিজের ধর্মসম্প্রদায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার দায়ভার চাপিয়ে বাবা

দেবেন্দ্রকিশোর দেবব্রতকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। শুরুতে তাঁর ভীষণ খারাপ লাগত। প্রকাণ্ড হা করা একটা শহর, সবাইকে যেন গিলে নিচ্ছে। কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। ধীরে ধীরে বন্ধু গড়ে উঠতে থাকে। এক একটা দিনকে দেবব্রতর তখন আর অতো খারাপ মনে হয় না।

সত্যি বলতে কী, 'ব্রাহ্ম' পরিচিতিতেই তো তাঁর কলকাতা আসা। কলকাতায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে যেতেন, সেকথা খানিকটা আগেই আমরা বলেছি। প্রার্থনা সভায় নিয়মিত গান হত। এসব গান তাঁর সব-ই জানা। মায়ের কাছে ছোটোবেলায় শিখেছেন। প্রথমে সংকোচ হত খানিকটা। পরে সেই সংকোচ পুরোপুরি কেটে যায়। ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অনুষ্ঠান তালিকায় 'মাঘোৎসব' বেশ বড়ো জায়গা দখল করে রয়েছে। এর প্রস্তুতি অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়। নানা ব্রাহ্ম পরিবারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুষ্ঠানের রিহার্সাল হত। মন্দিরেও মাঝে মাঝে হত। সেসব গান শেখাতেন যাঁরা, তাঁদের কয়েকজনের নাম দেবব্রত বলেছেন। সুবালা আচার্যের কথা বলেছেন তিনি। সুবালা ছিলেন ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী। ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য রবীন্দ্রনাথ যে বছরে জন্মেছেন সে বছরেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' হয়েছিলেন। সুবালা ব্রাহ্মমন্দিরে গান শেখাতেন। আরও অনেকেই ছিলেন। সুকুমার রায়ের পত্নী সুপ্রভা রায় ছিলেন। কনক বিশ্বাস ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের ভাবী-সহধর্মিনী 'বিজয়া' ছিলেন। তালিকা পুরোপুরি দিতে গেলে অনেক নাম দিতে হয়।

সে সব গান কে লিখেছেন, কে সুর দিয়েছেন, কোথায় স্বরলিপি রয়েছে- এমন কথা বলতেন না কেউ। এক ধরনের গান ছিল, ব্রাহ্মসমাজের গানের আসরে 'রবিবাবুর গান' হিসেবে পরিচিতি ছিল। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে, দেবব্রত লিখছেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' কথাটা কবে প্রথম চালু হল তিনি ঠিক জানেন না।

অনেকের সামনে গাইতে গেলে সকলেরই প্রথম জীবনে খুব ভয় করে। দেবব্রত তার চেয়ে আলাদা ছিলেন না। একক কণ্ঠে গাইতে বললে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। দ্বৈতকণ্ঠে হলে ক্ষতি নেই, সমবেত হলে সবচেয়ে ভালো।

কলকাতার জীবন : দ্বিতীয় ভাগ

'রবিবাবুর গান' নিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিক যে কথা লিখেছেন তা হল এরকম :

"১৯২২ সালের কথা। আমি তখন কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেকালে ছিলেন 'রবিবাবু'। এই 'রবিবাবুর গান' যে কি বস্তু তখনো ভালো করে জানি না। শুধু শুনেছিলাম যেভাবে, ভাষায় ও সুরে সে নাকি অতি সুন্দর গান। মন কেবল উৎসুক হয়ে ঘুরে বেড়াতো—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শিখতে হবে।"

১৯০৫ সালে পঙ্কজকুমারের জন্ম। দেবব্রত তাঁর চেয়ে মাত্র ছয়বছরের ছোটো ছিলেন।

দেবব্রত চিরবিদায় নিয়েছেন ১৯৮০ সালে। পঙ্কজকুমার মল্লিক তার দুইবছর আগে, ১৯৭৮ সালে, পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। সন্তোষ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব প্রথমে পঙ্কজকুমারের, তারপর দেবব্রতর। পঙ্কজকুমারের সঙ্গীত পরিবেশনাকে অনেকে স্টীম রোলার চালানোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর পরিবেশনার পৌরুষ-ভঙ্গী, উদাত্ত গায়নরীতি প্রচলিত পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছিল। কালের বিচারে তিনি জয়ী হয়েছেন। যেমন কালের বিচারে জয়ী হয়েছেন দেবব্রত। দেবব্রত পঙ্কজ মল্লিকের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অর্ঘ্য সেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "রেডিওয় যখন পঙ্কজ মল্লিকের 'সংগীত শিক্ষার আসর' বিশ্রীভাবে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল, ওঁরা জর্জদাকে অফার দিলেন। জর্জদা যেন ওই আসরের ভার নেন, গান শেখান। জর্জদা বললেন, রামচন্দ্রের সিংহাসনে ভরত কি বইছিল? বয় নাই।' নিলেন না সে অফার।"

যে সময় রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে মানুষের দরবারে এসেছেন পঙ্কজকুমার ও কয়েকবছর পর দেবব্রত, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের মান্যতা কেমন ছিল? আমরা পঙ্কজকুমারের লেখা থেকে শুনব :

'সে-যুগে তো আজকালকার মতো রবীন্দ্র-আবহাওয়া ছিল না। ছিল না রবীন্দ্রচর্চার এত ব্যাপক ও বিপুল আয়োজন। আমার রুচি-গঠন তো তাই আবহাওয়ার আনুকূল্য কিছু পায়নি। বিপুল জনসমাজে তাঁর গান ক'জন গাইতো তখন? যদিও বা কেউ গাইতেন, তাও বিচ্ছিন্নভাবে, দুটি-একটি গানের পুঁজি

নিয়ে, মেয়েলি ছাঁদে, মেয়েলি গলায়, ঘরে বসে পরিচিত মেয়েদের আসরে। আর বাছা বাছা কিছু গান গাওয়া হতো ব্রাহ্মসমাজে, সাধারণ বাঙালীকে তা স্পর্শ করতো না। ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে অগণিত সাধারণকে নিয়ে তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সেখানে সে-গানের রসগ্রাহী শ্রোতা সেকালে খুব বেশি ছিলেন না। ...বিশ্বকবির অনুপম রুচি-স্নিগ্ধ সুরবিহার তখন বাঙালির কানে পৌঁছলেও মরমে সবটা বোধকরি পৌঁছাতে পারেনি।'

ব্রাহ্মসমাজে দেবব্রত নিজে গান গাইতেন। পঙ্কজকুমার গান শেখার লোভে ব্রাহ্মসমাজে শ্রোতা হিসেবে যেতেন। পঙ্কজকুমারের কথায় '...কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শনিবার শনিবার ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন, আমি গান তোলার জন্য শুনতে যেতাম প্রায়ই।'

যে ব্রাহ্মসমাজে পঙ্কজকুমার রবীন্দ্রনাথের গান তুলে আনতে যেতেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে দেবব্রত লিখেছিলেন, 'তখনকার দিনে কোনো স্বরলিপির বই সামনে রেখে শেখানো হত না, গাওয়াও হত না।...তাঁরা ওইসব ব্রহ্মসংগীত ঠিকমতো গাইছেন কিনা এবং তাঁরা কোথায় এই সব গান শিখেছিলেন, এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে কখনোই জাগত না।'

দেবব্রত একটি কথা পরিষ্কারভাবে আমাদের জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গান করছি, এমন কোনো পৃথক সতর্কতার আবহাওয়া ব্রাহ্মসমাজে ছিল না। ব্রহ্ম-সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। পাঠক মনে করবেন না, সকল রচয়িতার গান ও সুরের সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের ফারাক দেখিনি। সে ফারাকের কথা আমরা পরে কখনো না কখনো বলব।

দেবব্রত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনার সময়ে যেমন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন, ব্রাহ্মবিবাহে গাইতেন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও গাইতেন। কী কী গান গাইতেন, বাড়িতে মায়ের সঙ্গে বসে কীসব গান গাওয়া হত, তার একটা তালিকা আমরা আগেই দিয়েছি। সকলের সঙ্গে গান গাওয়ার কথা না বললেও কনক দাসের সঙ্গে গান গাওয়ার কথা বলব। ১৯০৩ সালে কনক দাস কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জগৎমোহন দাস। মা সুগায়িকা সরলা দেবী। ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত ছিলেন কনক। ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর কলকাতা এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও শৈলজারঞ্জনের কাছে গান শিখেছেন। 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'-এ লেখা হয়েছে, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড হয়। দুটি গান। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' আর

'কবে তুমি আসবে'। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' থেকে আমরা জানতে পারছি ভিন্ন তথ্য। দেবব্রত তাঁর বইয়ে সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ১৯১৭ সালে গজল কীর্তন এসবের সঙ্গে কনক দাসের গাওয়া দুটি গান ছিল। প্রথম গান 'কবে তুমি আসবে'। দ্বিতীয় গান 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার'। 'চরিতাভিধান' ও দেবব্রত গান দুটি অবিশ্যি একই বলেছেন। সাল নিয়ে খটকা বাধছে। ১৯১৭ নাকি ১৯২৭? দেবব্রতের লেখায় এমন কথাও রয়েছে যে গান দুটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা, কোথাও সেকথা বলা হয়নি। ১৯৪৩ সালে কনক দাসের সঙ্গে দেবব্রতর জ্যাঠতুতো দাদা অজয় বিশ্বাসের বিয়ে হয়। কনক দাস হলেন কনক বিশ্বাস। আগে তিনি ছিলেন 'বুঁচিমাসী', বিয়ের পর হলেন 'বৌদি'। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু গানে গলা মিলিয়েছিলেন দেবব্রত। একটি গানের কথা তো বলেইছেন। 'হে মোর দেবতা'। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। বেশির ভাগ রবীন্দ্রসঙ্গ ীত। অতুলপ্রসাদের গান আছে। হিমাংশু দত্তের গানও গেয়েছেন। ১৯৬২ সালে স্বামীর প্রয়াণের পর গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনদশক তিনি 'গীতবিতান'-এর অধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯৮৮ সালের ৩১শে আগস্ট কনক বিশ্বাস প্রয়াত হন। স্বামীকে হারিয়েছিলেন যেমন, দেবব্রতের বিয়োগ ব্যথাও তাঁকে প্রায় একদশক সইতে হয়েছে।

কনক দাসের কথা খানিকটা বলেছি আমরা কেননা দেবব্রতর প্রথম গানের রেকর্ড তাঁর সঙ্গেই। সেকথায় পরে আসব।

ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত গান করলেও 'ব্রহ্ম' বা আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কোনোকালেই দেবব্রতর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর ছিল সাফ জবাব. 'গান গাইতে আনন্দ পেতাম তাই গাইতাম'। হিমাংশু দত্তের আধুনিক গান, কুমার শচীন দেববর্মনের গান, কুন্দনলাল সায়গলের গান ও আরও অনেক গান তিনি গাইতেন। 'উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা' কোনোকালে করেননি।

১৯৩১ সালে বি. এ. অনার্স পাশ করে দেবব্রত এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩৪ সালে দেবব্রত চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনের ছয়বছর নিয়মিত (১৯২৮-১৯৩৩) তিনি গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটিতে কিশোরগঞ্জে যেতেন। চাকুরির পর অতো ছুটি কোথায়? পুজোর ছুটিতে যেতেন শুধু। বাড়িতেও গানের আসর বসত। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করতেন ইন্দুভূষণ রায় (গোপাল)। তিনিও ছুটিতে বাড়ি আসতেন। দেবব্রতর চেয়ে তিনি ছয়-

সাতবছরের ছোটো ছিলেন। 'শান্তিনিকেতনের গান' গাইতে বলা হত তাঁকে। ইন্দুভূষণের কাছে দেবব্রত শান্তিনিকেতনের সকল উৎসব ও পালাপার্বণের কথা শুনতেন। সেখানে নানা উৎসব পালন তো লেগেই রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে শুধু 'মাঘোৎসব' আর 'ভাদ্রোৎসব'। প্রতিবছর ছুটিতে শান্তিনিকেতনের গল্প শুনতে শুনতে তাঁর ইচ্ছে হত, শান্তিনিকেতন যাবেন। একবার সুযোগ এল। দিনটি তিনি কখনো ভুলেননি। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস। শীতকাল। বাংলা তারিখটা ছিল ৬ই পৌষ। প্রথমবার দেবব্রত শান্তিনিকেতন যান। তখন তাঁর বয়স সবে কুড়ি পেরিয়েছে। একুশে পা দিয়েছেন। প্রথমবার গিয়েই তিন বিখ্যাত লোকের তিন আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে যায়। সকলেই কম বেশি সমবয়সী ছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্যিক জগদানন্দ রায়ের বিধবা কন্যা বাবার সঙ্গে থাকতেন। তাঁর ছেলে অনুপানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হয়। শিল্পী নন্দলাল বসুর সবচেয়ে ছোটো ছেলে গোরা বসু ও রেবা রায়ের ছোটো ভাই রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। রেবা রায়ের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১৯৩১ সালে 'যাত্রা হল শুরু'। তারপর প্রতিবছর দেবব্রত শান্তিনিকেতনের দুটো উৎসবে নিয়মিত যেতেন। 'পৌষোৎসব' আর 'বসন্তোৎসব'। কয়েকবার 'বর্ষামঙ্গল উৎসব'-এও গিয়েছেন। ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে ইন্দুভূষণের বন্ধুরা মিলে একটি ঘরোয়া গানের আসর বসিয়েছিলেন। গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস। কী গান করেছিলেন শিল্পী? সুবোধ পুরকায়স্থ ও অজয় ভট্টাচার্যের লেখা হিমাংশু দত্তের সুর দেওয়া কিছু গান গেয়েছেন। শচীন দেববর্মনের কয়েকটি গান গেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের মাটিতে সেদিন কেন তিনি একটিও রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন না? একটা কারণ কি এই, শান্তিনিকেতনে গিয়ে ছেলেমেয়েদের গলায় যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন, ওদের গাইবার ধরন-ধারণ তাঁর পছন্দ হত না? আমাদের মনে হয়, হয়তো তাই। বয়স এমন কিছুই হয়নি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের প্রধান চর্চাকেন্দ্র। এলে ভালোইতো দিন কাটে তাঁর। কেন তবে সুর ও স্বরে, হৃদয়ের মথিত আবেগে গান করে, বন্ধুদের মনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন গেঁথে দেবেন? ভালো না-লাগার কথা বলতে গিয়ে দেবব্রত খানিকটা পঙ্কজকুমারের মতোই সংলাপ উচ্চারণ করেছেন। তিনি বললেন, একটা কারণ হতে পারে এই যে, '...তখনকার দিনে সংগীতরসিকরা এবং সাধারণ শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান এবং ঋতু সংগীতগুলিকেও যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন না। এইসব গানগুলির প্রতি তাদের রীতিমতো অশ্রদ্ধাই ছিল।'

ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বা নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু' বা 'প্রেম' পর্যায়ের গান গাওয়া হত না। গাওয়া হত 'আধ্যাত্মিক গান'। মন প্রাণ খুলে গাইতেন গান, আধ্যাত্মিকতার জালে কখনও ধরা দিতেন না। এমন তো হতেই পারে। ঈশ্বরভাবনার পংক্তিমালায় সাজানো কোনো সুরেলা ও সহজিয়া গান, হাজার হাজার শ্রোতাকে আপ্লুত করতে পারে, শ্রোতাদের অনেকেই হয়তো ঈশ্বরভাবনার কথা মনেই করতে পারলেন না। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমরা, এমনটা হয়। দেবব্রত আবার আরও এগিয়ে রয়েছেন। বলছেন, উপাসনার সময় যাঁরা আচার্যের বেদীতে বসতেন, সেই আচার্যদের কাছে তিনি কখনও ভিড়তেন না। রবীন্দ্রনাথ হলেও নয়। বললেন তো তিনিই, দেবব্রত, '...রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটু ধারণাও তখনকার দিনে আমার ছিল না, বুঝবার মতো বুদ্ধিও ছিল না।'

১৯৩৩ সালে এম. এ. পাশ। পরের বছর বিনা মাইনের চাকুরিতে ঢুকলেন। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানি। একটা বছর বিনা মাইনেতেই কাটল। ১৯৩৫ সালের মে মাসে মাইনের খাতায় নাম উঠল। মাসে পঞ্চাশটাকা। তখন টিউশনি করছেন। থাকার ঠিকানা ছিল এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর নাম রঞ্জিত চৌধুরী। ঠিকানা : জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড, ভবানীপুর, কলকাতা। ওই সময় ইন্দুভূষণ শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আই.এ. পড়বে বলে কলকাতায় এসেছে। একা থাকতে ভরসা পাচ্ছিল না। দেবব্রত তখন বন্ধুর বাড়ি ছাড়লেন। ভবানীপুরে রইলেন। ভবানীপুর থানার উল্টোদিকে একটা মেস বাড়ি ছিল। দাদা অজয় বিশ্বাস থাকতেন। তখনও তিনি কনক দাসকে বিয়ে করেননি। দুজনেরই ভরসা বাড়ল। দেবব্রত ও ইন্দুভূষণের। সেই মেসবাড়িতে চলে এলেন। পরে ইন্দুভূষণের মেজদি ও ভাগ্নে কলকাতায় এল. কেয়াতলা রোডে বাড়ি ভাড়া নেয়া হল। দেবব্রতকে ওরা ছাড়তে চাইল না। দেবব্রতর তিন নম্বর ঠিকানা হল কেয়াতলা রোড। একেই বোধহয় 'চরকি ঘোরা' বলে।

যে বাড়িতে চাকুরি করতেন দেবব্রত, তার নাম 'হিন্দুস্থান বিল্ডিং'। সেখানে একটা মেস আছে। চাকুরির জায়গার সবচেয়ে কাছাকাছি। এর চেয়ে বেশি সুবিধে আর কিছুতেই হয় না। ১৯৩৫ সালে দেবব্রত হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর মেস বাড়িতে চলে এলেন।

হিন্দুস্থান ইন্সসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি করতে এসে প্রথম তাঁর ঠাকুরবাড়ির একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার আগে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে তিনি দূর থেকে দেখেছেন। যাঁর সঙ্গে দেবব্রতর প্রথম আলাপ

হল তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০)। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান। ব্রাহ্মসাজের তিনি একসময় কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তিনি বিয়ে করেন। ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' নির্বাচিত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্র সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কন্যাসন্তানের নাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সমবায়, বীমা ও ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। ১৮৯৩ সালে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। জীবনবীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। 'বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি'-র সংগঠক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই সমিতি থেকেই পরে 'অনুশীলন সমিতি' তৈরি হয়। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। বোম্বাইয়ের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সময় তিনি শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমবায় বীমা আন্দোলনকে সফল করতে তিনি সারা উত্তর ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন। অম্বিকা উকিলের সহযোগিতায় 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখার হাত তাঁর খুবই সাবলীল ছিল। সোভিয়েত বিপ্লবের উপর 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' গ্রন্থ রচনা করেন সুরেন্দ্রনাথ। দেবব্রত তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর চেয়ে চল্লিশ বছরেরও বড়ো ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। যখন চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন দেবব্রত, সুরেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেছেন। কোম্পানির অন্যতম প্রধান হিসেবে তিনি হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ আসতেন। চারতলার একটি ঘরে বসতেন। তবে বেশিদিন তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটেনি। ১৯৪০ সালে সুরেন্দ্রনাথ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫-১৯৫৩) বয়সে ছিলেন দেবব্রতর চেয়ে ছয় বছরের বড়ো। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতেই কাজ করতেন।

সুবীরেন্দ্রনাথের মায়ের নাম সংজ্ঞা দেবী। সুবীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও সংজ্ঞা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুবীরেন্দ্রনাথের পিতামহ সত্যেন্দ্রনাথ সুরেন ও বিবি (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ডাক নাম) এই দুই নাম মিলিয়ে নাতির নাম রেখেছিলেন সুবীরেন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতনে পড়তে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানকার নিয়ম না মেনে চলায় এল্মহার্স্ট তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সুরেন্দ্রনাথ ছেলের এমন শাস্তি 'যথাযথ' বলেই মনে করেছিলেন। সুবীরেন্দ্রনাথ কাশীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান। সেখানেও পড়া শেষ করেননি। বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টার

হবেন। তাও হয়নি। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, '...অতদিন বিলেতে থাকার দরুন ইংরেজি বলতে কইতে বেশ শিখেছিল, নানা বিষয়ে চোখ কানও খুলে গিয়েছিল।'

সুবীরেন্দ্রনাথ মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। তার দুই পুত্র দুই কন্যা। এক কন্যা সুপূর্ণা চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের গান করেন। সুপূর্ণার স্বামী সুভাষ চৌধুরী বিশিষ্ট সঙ্গীত সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সুবীরেন্দ্রনাথ দেবব্রতকে প্রথম তাঁর পিসিমা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে নিয়ে যান।

১৯৩৪ সালে চাকুরি জীবন শুরু করেছিলেন দেবব্রত। ১৯৭১ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর চাকুরি জীবনের কথা বলতে গিয়ে একজন সহকর্মীর স্মৃতিচিত্রের কথা উল্লেখ করব। তিনি চন্দ্রশেখর বসু। তাঁর লেখা পড়েছি। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও কথা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে যোগ দেন চন্দ্রশেখর বসু। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি দেবব্রতকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দীর্ঘকাল বীমা আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে কাজ করেছেন চন্দ্রশেখর। ১৯৫৫ সাল থেকে 'অল ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের' সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সাল থেকে একটানা তিরিশবছর এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছু টুকরো ঘটনার কথা বলেছেন যা থেকে মানুষটির প্রতিবাদী মন চিনতে পারা যায়। চন্দ্রশেখরবাবুর কথায়, 'জর্জদা হিন্দুস্থান-এ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেননি ঠিকই, কিন্তু চিরকালই আমাদের, প্রতিবাদ ও আন্দোলনে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মতো ছাতা ধরে রেখেছিলেন।'

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মহা মন্বন্তর ঘটে গিয়েছে। তখনই চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কর্মচারীদের সেসময় যা মাইনে ছিল, সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত যখন হিটলারের নাৎসিবাহিনীকে পরাজিত করল, দেশে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে আন্দোলন গড়ার অনুপ্রেরণা তৈরি হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানির মালিকপক্ষ সেসব দাবিদাওয়ায় কর্ণপাত করতেন না।

ঘটনা : ১

> একজন সহকর্মী অফিসে খবর পেলেন তার বাবা মারা গিয়েছেন। তিনি দরখাস্ত করে ছুটি চাইলেন। ছুটি দেওয়া হল তাকে, দরখাস্তে লিখে দেওয়া হল, বাবার শেষ কাজ সমাধা করে তিনি যেন ওই দিন অফিসে ফিরে আসেন। কেননা, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। জর্জদা এই ঘটনার কথা শুনে অতোটাই

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, কারও সঙ্গে সেদিন আর কথা বলেননি। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র ক্ষোভের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

ঘটনা : ২

অফিসের অ্যাকাউন্টস বিভাগে সুরেন নামে একজন কাজ করতেন। অফিসের বড়োকর্তা খবর পেয়ে তাকে টাকা দিয়ে ডালহৌসিতে দুবোতল হরলিক্স কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ভীষণ আকাল তখন হরলিক্স-এর। যুদ্ধ করে প্রায়, নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে একবোতল জোগাড় হল। সুরেন অফিসে আসতেই বড়োকর্তা তাকে বললেন, 'মিথ্যে বলছিস, তুই, আর একটা বোতল নিশ্চয়ই বেশি দামে বেচে দিয়েছিস।....কাল থেকে তুই আর অফিসে আসবি না।'

এঘটনার কথা যখন সহকর্মীদের কানে যায়, সবাই রেগে যায়। ঠিক হয়, এবার ইউনিয়ন গড়তে হবে। তখন কোম্পানির সবচেয়ে বড়োকর্তা নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনি তার কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মীকে দিয়ে খবর পাঠালেন, ইউনিয়ন হোক, ইউনিয়ন তোমাদের দখলে রাখতে হবে। প্রথম বছর কয় তাই ছিল। ১৯৪৭ সালের আগে সেই ইউনিয়নে চন্দ্রশেখরবাবুরা থাকলেও ছড়ি ঘোরাবার লোকেরা ছিল নলিনীরঞ্জনের বশংবদ।

১৯৪৭ সাল। দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেবব্রত ততোদিনে গণনাট্য আন্দোলনের এক বরেণ্য সংগঠক। সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক। অফিসের এসব অন্যায় তিনি সইতে পারতেন না। সহকর্মীদের কাছে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করতেন। ১৯৪৭ সালে অফিসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। যিনি একাজে প্রথম এগিয়ে আসবেন তিনি দেবব্রত। তাঁকে গিয়ে বলতেই অনেককে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এসেছিলেন। জর্জ বিশ্বাসের পরিচয়ে কতো শিল্পী বিনা সাম্মানিকে গান গেয়েছেন। সেই তালিকায় বলা যেতে পারে, কোনো শিল্পীই বাদ ছিলেন না। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন। নাচের অনুষ্ঠানে এসেছেন মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। আবৃত্তির অনুষ্ঠানে এসেছেন তৃপ্তি মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

দেবব্রত বিশ্বাসের পরিচিতির বিস্তার দেখে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সাহস বেড়ে যায়। ১৯৬১ সাল। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ। টানা পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। দক্ষিণ কলকাতার সিংহী পার্কে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে গ্যালারি তৈরি হয়। কয়েক হাজার মানুষ সেই অনুষ্ঠান দেখেছেন।

পার্ক সার্কাসের বিখ্যাত অনুষ্ঠানের পর মহানগর কলকাতায় এই অনুষ্ঠান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আয়োজনের প্রধান যিনি, তিনি দেবব্রত বিশ্বাস। বিখ্যাত সব শিল্পীরা এসেছেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরাও এসেছেন। সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশিত হয়েছিল। কে উদ্বোধন করবেন এমন অনুষ্ঠান? গড়পরতা হিসাবের বাইরে কাউকে চাই। সৈয়দ মুজতবা আলীকে বললে ভালো হয়। কে বলবেন তাঁকে? ত্রাণকর্তা জর্জ বিশ্বাস। জর্জদা আয়োজকদের কানাইলাল সরকারের কাছে নিয়ে যান। কানাইলাল আনন্দবাজারে ছিলেন তখন। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বইয়ে লিখেছেন দেবব্রত, শান্তিনিকেতনে যখন তিনি যেতে শুরু করেছিলেন, যে কজনের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, কানাইলাল তাঁদের একজন। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন। তিনি রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে সময়মতো আসছেন না আলিসাহেব। বাইরে প্রচুর দর্শক অস্থির হয়ে উঠছেন। আয়োজকেরা হতভম্ব। জর্জদা শুনে সোজা মঞ্চে চলে যান। শ্রোতাদের বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে গিয়েছেন। যে কোনো সময়ে চলে আসবেন তিনি। ততক্ষণ আপনারা আমার গান শুনুন।' বৃষ্টি হচ্ছিল। মুগ্ধ সকলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গান শুনেছেন। এই ছিলেন জর্জ বিশ্বাস। অসহায়তা থেকে কাউকে উদ্ধারের সামর্থ্য থাকলে তিনি কখনও মুখ ফিরিয়ে থাকেননি।

১৯৫০ সালে ইউনিয়নের আন্দোলনে কোর্ট কাছারি হল। ভালো উকিল চাই। বোম্বের একজন বিখ্যাত উকিল জর্জদার কথায় রাজি হয়ে যান। মামলা হল। রায় মালিকপক্ষের দিকে গেল। কোম্পানি ১৯৫২ সালে চন্দ্রশেখর বসুকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। নলিনীরঞ্জন সরকার তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। নলিনীবাবুরা ইউনিয়নকে তিনটি শর্ত দিলেন। প্রথম শর্ত, চন্দ্রশেখর বসুকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে। বলতে হবে ভবিষ্যতে তিনি এভাবে মালিকপক্ষের বিরোধিতা করবেন না। দ্বিতীয় শর্ত, আদালতে যে মামলা চলছে, ইউনিয়নকে সেই মামলা তুলে নিতে হবে। তৃতীয় শর্ত, আগামী তিন বছর কোনো দাবিদাওয়া নিয়ে ইউনিয়ন আসতে পারবে না।

কী উত্তর দিয়েছিল ইউনিয়ন? প্রথম শর্ত কিছুতেই মানা হবে না। চন্দ্রশেখর বসুকে চাকুরিতে ফিরিয়ে নেয়া হলে বাকি দুটি শর্ত ইউনিয়ন ভেবে দেখবে। চন্দ্রশেখরবাবু লিখেছেন, তখন দেবব্রত তাঁকে রোজ-ই বলতেন, 'বলতে লজ্জা করো না। আমার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে যতদিন খুশি থাকতে খেতে পার।' কিছুই বলছেন না যখন, একদিন ধমকের সুরেই বললেন। কেমন যেন

বাধ্য হয়ে চন্দ্রশেখরবাবু দেবব্রতর সঙ্গে সেই বাড়িতে যান একদিন। কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন।

এই সুযোগে একটা কথা বলে নিই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবব্রতর সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। বইয়ের ভূমিকায় আমি শিল্পীর মুখ থেকে শোনা একটা কথা লিখেছি। পাঠক অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন। পরেও আমরা দেখব, এই সম্পর্ক ছিল কতো গভীর। চন্দ্রশেখর বসুর লেখা থেকেও আমরা জেনেছি দুজনের সম্পর্কের কথা। হেমন্তকেও চেনা যায়। সেই সময় প্রখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রায় রোজ সকালে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে আসতেন। নানা কথা হত। জর্জদার কাছে একদিন কোম্পানির কর্মীদের আন্দোলনের কথা শুনলেন। চন্দ্রশেখরবাবুর বরখাস্ত হয়ে যাওয়ার কথা শুনলেন। শুনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কক্ষনো ক্ষমা চাইবেন না। আন্দোলন চালিয়ে যান। প্রয়োজনে আমরা শিল্পীরা হারমোনিয়ম কাঁধে নিয়ে আপনাদের জন্য রাস্তায় নেমে অর্থ সংগ্রহ করব।'

ঘটনা : তিন

এই ঘটনা আমার চন্দ্রশেখরবাবুর নিজের মুখ থেকে শোনার সুযোগ হয়েছে। বছর কয়েক আগে ওঁদেব ইউনিয়নের আমন্ত্রণে একটি সভায় হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ যাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, দেবব্রত বিশ্বাস তো এখানে অনেকদিন চাকুরি করছেন। তার কিছু নথিপত্র কি আমি পেতে পারি? তিনি কিছু পরামর্শ দেন যা আমার কাজে লেগেছে। আর এই ঘটনাটি বলেন।

তখন চন্দ্রশেখরবাবুকে কাজে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন দ্বিতীয় আর তৃতীয় শর্ত মেনে নিয়েছে। একটা স্তিমিত পরিবেশ ছিল অফিসে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন এল। ছোটো আকারে জন্মদিন পালিত হবে। কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথ শান্তির কবি, প্রেমের কবি এসব কথা বললেন। আরও বললেন, তাঁর কথা মনে করেই কোনো অশান্তি করা ঠিক নয়। বক্তৃতার বদলে উপদেশ বর্ষিত হতে থাকল। একটা চাপা ক্ষোভ ঘরটিতে তৈরি হয়েছিল। যেই জর্জদা আগে বলেছিলেন, তিনি গান করবেন না, তিনিই উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন। 'রবীন্দ্রনাথের ভুল পরিচয় যাচ্ছে সকলের কাছে। যেখানে যত লাঞ্ছনা, মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন, রবীন্দ্রনাথ তার সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন। এখানে অবিচার হচ্ছে। আমি আজ এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের গান গাইব।' একের পব এক অনুপ্রেরণার গান গাইলেন দেবব্রত। সভাপতি সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু 'কাজ আছে' বলে সভা ছেড়ে চলে যান।

জর্জদাকে কিন্তু ইনসিওরেন্স কর্তৃপক্ষ রেহাই দেয়নি। ১৯৫৪ সালে ছত্রিশজন কর্মীকে নোটিশ ধরানো হল। 'অফিসে উত্তেজনা দেখিয়েছ। হইচই বেশি করেছ।' অবাক হবেন না বন্ধুরা। সেই ছত্রিশজনের তালিকায় দেবব্রত বিশ্বাসের নামও ছিল। পরে অনেক আলাপ অলোচনা হয়। কোম্পানির মাতব্বরেরা সেসব নোটিশ তুলে নেয়।

দেবব্রত যতোদিন এখানে চাকুরি করেছেন, কেমন কাটিয়েছেন, অবসর গ্রহণের সম্বর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ-ই তার পরিচয়। সেটি আমরা বইয়ে যোগ করেছি।

শিল্পীর নবজন্ম

১০ই এপ্রিল ১৯৩৬ সাল। লক্ষ্নৌ শহরে হল 'সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের' প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনের প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন সাজ্জাদ জাহির। কী হবে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এই নিয়ে লিখলেন সাজ্জাদ।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন বসে। সেখানে প্রতিবেদন রচনা ও পাঠ করেন মূলক রাজ আনন্দ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠে তার বছর পাঁচ পরে। ১৯৪৩ সালের ২৫শে মে বোম্বাইয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। সংঘের প্রথম বুলেটিন প্রকাশিত হল ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে। বুলেটিনে সংগঠনের আদর্শ, কার্যধারা ও উদ্দেশ্য লেখা ছিল।

একালের অনেকেই জানেন, দেবব্রত বড়ো ছোটো না ভেবে বেশিরভাগ মানুষকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। 'তুমি' বলতেন অল্প কজনকেই। 'তুই'-এর দলে তো আরও কম। এক দুজন ছিলেন জানি। পারিবারিক আত্মীয়দের বাইরে 'তুই' প্রায় বলতেন-ই না। যে দুজনকে বলতেন, একজন চিন্মোহন সেহানবীশ। একজন মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। চিন্মোহনও ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছেন। ১৯১৩ সালে জন্ম। দেবব্রতর চেয়ে দুবছরের ছোটো। রংপুরে জন্মভিটে ছিল বাবার। তিনি লাহোরে জন্মেছেন। দেবব্রতের পিতামহ কালীকিশোর বিশ্বাসকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অপরাধে যেমন নানা লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল, চিন্মোহনের পিতামহ বিপিনমোহন সেহানবীশের জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছে। নিজের গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। দেবব্রত অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন (১৯৩৩)। চিন্মোহনের বেলাতেও তাই। ১৯৩৫ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯৪১ সালে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতেই চাকুরিতে যোগ দেন চিন্মোহন। এমন চাকুরি তাঁর পছন্দ হত না। ১৯৪৬ সালে বছর পাঁচ চাকুরির পর চাকুরি ছেড়ে দেন। ওই সময় কোম্পানির ভেতরে ও কোম্পানির বাইরে কয়েকটি জায়গায় দুজনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই বইয়ে আমরা চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা দেবব্রত বিশ্বাসের উপর একটি রচনা যোগ করেছি। সেখানে অনেক দরকারি কথা

রয়েছে। অনেকের মতে চিন্মোহনও দেবব্রতর গান ব্রাহ্মসমাজেই শুনেছেন। হয়তো মাঘোৎসবের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বা কোন বন্ধুর বাড়িতে অথবা ব্রাহ্ম বাড়ির বিয়ে বা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে। লিখেছেন চিন্মোহন, 'দ্বিতীয়ত আমরা দশবছর একত্র চাকরি করেছি হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে।' 'চরিতাভিধান' থেকে মনে হয় দশ নয়, ছয়বৎসর।

চিন্মোহন লিখেছেন, আপিসে চাকুরি করার সময় জর্জের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলাপ হত, 'তার কাছ থেকে চাঁদাও নিতাম পার্টির জন্য-এর বেশি কিছু নয়।' জর্জ কি পরে পার্টি সদস্য হয়েছিলেন? সুধী প্রধান লিখেছেন, 'জর্জ কোনদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি বা পার্টির নীতি নিয়ে তত্ত্বগত পড়াশুনা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি।' শিল্পীর সাতাশতম জন্মবার্ষিকী (?) উপলক্ষে 'দেবব্রত বিশ্বাস এ্যাকাডেমি' একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে 'অন্তরঙ্গ জর্জদা' বলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও গবেষক পার্থ ঘোষের একটি লেখা রয়েছে। পার্থবাবুর লেখা থেকে তুলে ধরছি :

—'আপনি তো Communist, আপনি এসব কথা কেন বলছেন?' বেশিরভাগ সময় দেবব্রত তাঁর সেসব জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন না। একবার বলেছিলেন, 'যেদিন চীনে গিয়া দ্যাখ্‌লাম, যে মাও-সে-তুং নেহেরুর সঙ্গে হ্যান্ডসেক করছে, সেই দিন থাইক্যা আমি Party ছাইড়া দিছি।'

তবে কি দেবব্রত বিশ্বাস পার্টির সদস্য ছিলেন? পার্থবাবু লিখেছেন '—উনি IPTA তে ছিলেন। Communist Party র Memberছিলেন।' চিন্মোহন সেহানবীশ বা সুধী প্রধানের (যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগঠক) কথা পড়ে তা মনে হয়নি ˙ লু শুন কি পার্টি সদস্য ছিলেন? মাও সে তুং-এর ভাষায় 'নন-পার্টি বলশেভিক'। দেবব্রতকে আমরা তেমন করে হয়তো বা ভাবতে পারি।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। কংগ্রেস আওয়াজ তুলল 'না এক পাই, না এক ভাই'। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য এক পয়সাও দেব না, এক ভাইকেও যুদ্ধে পাঠাব না। আওয়াজ-ই সার। কাজে কর্মে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সত্যিকারের উদ্বেগ দেখেছি আমরা রবীন্দ্রনাথের চোখে-মুখে। ও লেখায়। তাঁর পাশে আরও কয়েকজন ছিলেন। এঁদের বেশিরভাগই প্রগতিশীল লেখক সংঘের সদস্য।

সুধী প্রধান লিখেছেন, ১৯৩৯ সালের শেষদিকে, চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি, সে যাই হোক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন ছাত্রকে নিয়ে একটা 'গবেষণা ও সমীক্ষাদল' তৈরি হল। ১৯৪০

সালের মাঝামাঝি সময়ে এর নাম দেওয়া হয় 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' (YCI)। একে গণনাট্য আন্দোলনের 'আঁতুড়ঘর' বলা যেতে পারে। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন জ্যোতি বসু, নিখিল চক্রবর্তী, রেনু রায়, শ্যামানাথ সিন্‌হা, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জলিমোহন কাউল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সেন, হরকুমার চতুর্বেদী, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, রমা গোস্বামী, উমা চক্রবর্তী (পরে সেহানবীশ), কমল বসু, দেবব্রত বসু, দিলীপ রায়, চিত্রা মজুমদার, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

বলতে বাধা নেই, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই সকলে এসেছিলেন। YCI 'র কাজ ছিল শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানা আলোচনাসভার আয়োজন করা। ওঁরা বেশ কয়েকটি ভালো নাটকও করেছিলেন। জলি কাউল নাটক লিখিয়ে অভিনয় করান। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানি' অভিনীত হল।

'YCI'এর প্রথম সভা বসেছিল বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী সুনীল জানার বাড়িতে। চিন্তামণি কর সভাপতি ছিলেন। বিশিষ্ট ভাস্কর চিন্তামণি কর তখন সবে স্পেন থেকে ফিরেছেন। একটা কমিটি হল। সভাপতি হলেন অধ্যাপক শাহীদ সুরাবর্দি (অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন)। কলকাতার এক সময়কার মেয়র এ কে এম জাকারিয়া ও নীহাররঞ্জন রায় সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। শাহীদ সুরাবর্দি এমন সংগঠনে উৎসাহী হলেও সভাপতি হতে রাজি হলেন না। কিছুদিন পর স্টুডেন্টস হল-এ সভা হল। জলিমোহন কাউল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

পি-৩৩ মিশন রো ঠিকানায় যে 'কেন্ট হাউস' ছিল সেখানে একটি রুম ভাড়া নেয়া হয়। মাঝে মাঝেই আলোচনা সভা, বিতর্ক, নাটক এসব হত।

YCI এক সময় 'সম্মেলক সঙ্গীত' বা 'কমিউনিস্ট সঙ্ঘ'-এর কথা ভাবতে থাকল। কথাটা সম্ভবত প্রথম তুলেছিলেন নিখিল চক্রবর্তী। তিনি আগনেস স্মেডলির লেখা 'Battle Hymn of China' পড়েছেন। সেই বই পড়লে জানা যায়, 'সমবেত সঙ্গীত' বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সঙ্গী। গানের প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী, সে তো আমরা জানিই। যারা সমবেত সঙ্গীতের কথা ভাবছিলেন তাঁরা বালিগঞ্জ প্লেসে অর্পিতা দাশের বাড়িতে মহড়া দিতেন। অর্পিতা ছিলেন সে সময়কার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ান। সেই মহড়ার শিল্পীরা ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, দিলীপ রায়, সাধনা বসু (পরে রায়চৌধুরী) নিবেদিতা বসু, (পরে দাস), বিনতা বসু (পরে রায়, বিখ্যাত অভিনেত্রী), উমা চক্রবর্তী (পরে

সেহানবীশ), নিখিল সেন, দ্বিজেন চৌধুরী। তাঁদের গানের তালিকায় থাকত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দেশাত্মবোধক গান, ইংরেজিতে বিদেশের বিপ্লবী সঙ্গীত। মাঝে মাঝে নিজেদের লেখা গানও তাঁরা গাইতেন। 'ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা' ও 'হিন্দুস্থান হামারা হ্যায়' প্রায়ই গাওয়া হত। জলি কাউল লিখলেন 'মজদুর, মজদুর, মজদুর হ্যায় হাম'। অসাধারণ গান। অসাধারণ সুর দিলেন নিখিল সেন। সে গানের চাহিদা ছিল অভাবনীয়। একবার আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ অনুষ্ঠান হচ্ছে। ওই গানটি গাওয়া হচ্ছিল যখন, প্রবীণ অভিনেতা ও সুগায়ক পাহাড়ি স্যান্যাল মঞ্চে উঠে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গাইলেন।

সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে দেবব্রত ছোটোবেলা থেকেই তো পরিচিত। তবে সেসব 'ব্রহ্মসংগীত'। নতুন ভাবনার সম্মেলন ও সঙ্গীত দেবব্রতকে গভীরভাবে মাতিয়ে তুলেছে। তাঁর দক্ষতা তখন-ই প্রশ্নাতীত। চিন্মোহন সেহানবীশ লিখলেন, '....Community Singing আন্দোলনের অদ্বিতীয় নেতা আবিষ্কার করলাম আমাদের বহুদিনের বন্ধু জর্জ বিশ্বাসের মধ্যে।'

মিশন রো-এর বাড়ি থেকে ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট'-এর কর্মকেন্দ্র ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে আসে। এই সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ড ছিল খুবই উঁচুমানের। সাংস্কৃতিক বোধ ছিল প্রশংসনীয়। এঁরা নিয়মিত আলোচনাসভারও আয়োজন করেছেন। নানা বিষয়ের বিখ্যাত লোকেরা সব বক্তৃতা করতে আসতেন। 'সংস্কৃতির সংকট' বিষয়ে একবার একটি পোস্টার প্রদর্শনী হয় মহাবোধি সোসাইটি হলে। ভালো সাড়া পড়ে। সেই প্রদর্শনীতে সত্যজিৎ রায় কয়েকটি পোস্টার এঁকে দিয়েছিলেন।

৪৬নং বাড়িতে উঠে আসার পর সমবেত সঙ্গীতের মহড়া এ বাড়িতেই হয়েছে। একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠান হল। বিনয় রায় তাঁর সুরেলা ও বলিষ্ঠ কন্ঠে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিলেন। বিনয় রায়ের কথা আমরা পরে বলব। বিনয় রায় ও রেবা রায় এই দুই ভাইবোনের অবদান আমরা কখনও উপেক্ষা করতে পারব না। ওই সময়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন সেই বিখ্যাত গান 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ'। ঘরের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ রইল না গান। শ্রমজীবী মানুষ এমন অনুষ্ঠান দেখলে ছুটে আসতেন। চিন্মোহন লিখেছেন, '...বিনয় বা দেবব্রত বা জ্যোতিরিন্দ্র থাকলে ব্যস্ত পথচারীরাও ভীড় করে আসতেন মনে পড়ে।'

১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ' তৈরি হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকার রাজপথে খুন হলেন সোমেন চন্দ। বাঙালি লেখক শিল্পীরা এর

প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন সেদিন। ২৮শে মার্চ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলনে যোগ দেন অনেকেই। সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, আবু সইদ আইয়ুব। এঁরা কেউ প্রগতি লেখক আন্দোলনে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। তবু এই সম্মেলনে এসেছিলেন। গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত এঁরা তো ছিলেনই। এই সম্মেলন থেকে ঘোষিত হল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'-এর জন্মকথা। এই সংঘে নিয়মিত বসত 'বুধবারের বৈঠক'। কে না এসেছেন! তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতই প্রায় আসতেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্র মাঝে মাঝে এসেছেন। বিষ্ণু দে, রাধারমন মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টচার্য যে আসরের আলোচক, সে আলোচনার মান কেমন হবে, বক্তৃতা করে বোঝানো যায় না। সত্যি বলতে কী, লিখেও বোধহয় বোঝানো যায় না।

এমন রত্নমেলায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা বিনয় রায় থাকতেন। গান দিয়ে মনের ভুবন ভরিয়ে তুললেন সকলের। 'বুধবারের আসর' যে কতো ঘটনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হারাণের নাতজামাই'-এর মতো বিখ্যাত গল্প পড়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য এক সন্ধ্যায় পড়েছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'। এখানে পড়া হয় একাধিক নাটক। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই নাটক পড়েছেন। ৪৬নং-এ এসেছেন বাংলার দুই বিখ্যাত কবিয়াল শেখ গোমহানি ও রমেশ শীল।

এই যে সময়টার কথা বলছি আমরা, তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৩৪ সালে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। অসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে সবাইকে তখন নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। ১৯৪৩ এর ভয়াবহ মন্বন্তরের ত্রাণকার্যে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি তৈরি করেছিলেন। সেই কমিটিতে বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি ডি গোয়েঙ্কা ছিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, পিপলস রিলিফ কমিটি ও আরও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জড়িত ছিল।

মনে পড়ে আমাদের, এই মন্বন্তরের করুণ পরিণতিতে যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হল সারা বাংলা জুড়ে, তার প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের

শিল্পীসত্তায়। তারই ফসল 'নবজীবনের গান'।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'সুধী প্রধান কর্তৃক/ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ/হইতে প্রকাশিত হয় 'নবজীবনের গান'। 'নবজীবনের গান' বাংলা সঙ্গীত সম্ভারের এক সেরা সম্পদ। 'কবি-শিল্পী-সুরকার সংগীতভাবুক' জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন :

' চৌরঙ্গী, কালীঘাট... শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড় সর্বত্র এক দৃশ্য— শত সহস্র কঙ্কাল ফেন দাও, ফেন দাও বলে চিৎকার করছে।...গোরু-ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি।...

'একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।...আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম— না না না!...সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার উৎস মুখ থেকে ঝরনার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হল 'নবজীবনের গান'...।'

'ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন' এই বইটিকে সংগীত-সংরক্ষণ-প্রকল্পের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে ১৯৭৮ সালে নতুনভাবে প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন খালেদ চৌধুরী। এই সঙ্গীত-সংকলনের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আজ যদিও আমরা জানতে পারি না, কোন্ কোন্ গানের সুর সংযোজনায় দেবব্রত বিশ্বাসের কতটুকু অবদান, আমাদের অস্বস্তি নেই কোনো।

'এসো সমিতির সাম্যের ঐক্যে, এসো জনতার মুখরিত সখ্যে' গানের পংক্তি যিনি রচনা করেন সেখানে 'একক' অবদানের ভূমিকা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব কেন? গবেষণার কোনো নীতি ধর্মই এর সপক্ষে রায় দেবে না। এই সংকলনের গান ও সুর রচনায় দেবব্রত যে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন তা গ্রন্থটির 'নিবেদন' থেকেও বোঝা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে সরোজিনী নাইডু একবার একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটি প্রকাশকবন্ধুরা দেবব্রত বিশ্বাসের সৌজন্যেই পেয়েছেন। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি পাণ্ডুলিপিও দেবব্রতই দিয়েছেন।

কৃশকায় সঙ্গীত-গ্রন্থ। ঐতিহাসিক সঙ্গীত-গ্রন্থ। একটি গ্রন্থের রচনাকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (ও দেবব্রত বিশ্বাস)। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ খালেদ চৌধুরী। স্বরলিপি রচনা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। শিল্পীর জীবনকথা লিখেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। এই গ্রন্থকে আমরা ঐতিহাসিক বলব না? 'ঐতিহাসিক' বলবার আরও কারণ রয়েছে। প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি গানের সুর

('ঝঞ্ঝার গান', ও 'গাজন') প্রকাশকদের দিয়েছিলেন। স্বরলিপি রচনার প্রধান কারিগর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ হলেও ছিলেন আরও একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ প্রফুল্লকুমার দাস। ১৯৪৫ সালের ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই বই প্রকাশে ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী ও সুধী প্রধান সহায়তা করেছেন।

আলাদাভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জীবনকথা না লিখে আমরা চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা জীবনকথাটুকু এখানে যোগ করছি।

পাবনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) শীতলাই গ্রামের জমিদার, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে যুক্ত (এক সময়ে দেশবন্ধুর অন্যতম সহকারী) যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর কন্যা ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর ভগিনী, সরলা দেবীর তৃতীয় পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের জন্ম মামার বাড়ি শ্রীরামপুরে। অন্য পাঁচ ভাইয়ের নাম যথাক্রমে : জগদিন্দ্রনাথ, স্বামী বিমলানন্দ, (সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গার্হস্থ্য নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ), রথীন্দ্রনাথ, রণেন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ। ছয় বোনের নাম যথাক্রমে : প্রতিভা (সিংহ), অণিমা (চক্রবর্তী). কণিকা (বিশ্বাস), শান্তি (রায়), বাসন্তী (সিকদার), এবং অন্নপূর্ণা (রায়)।

শিক্ষা পাবনা জেলা স্কুল ও পরে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে, কলকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে (১৯২৭-৩১)। ১৯৩১ সালে ঐ কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এস.-সি পাস করেন। পরে মেডিকেল কলেজে 'সিট' পেলেও সাহিত্য-পাঠের আকর্ষণে ইংরেজিতে বি. এ. (স্পেশাল)পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৩ সালে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, প্রণতি রায়চৌধুরী, ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ। অল্প বয়স থেকেই ছিল গান গাওয়ার ঝোঁক— রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান। পরে হরিচরণ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন এবং রবীন্দ্রসংগীত শেখেন সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। আবার বিষ্ণু দে, নীরদ চৌধুরী ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় হয়। অন্য দিকে শীতলাই হাউসে আনাগোনা ছিল রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনেতাদের। এই পরিবেশে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষ হয় আর কলেজ পাঠের সময় তাঁর 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৯৩৮ সালে রিচি রোডের বিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচির কন্যা

উর্মিলাকে বিবাহ করেন। (উর্মিলার মৃত্যু ৪ অগাস্ট, ১৯৭৩ দিল্লী প্রবাসকালে)। পুত্রকন্যাদের নাম যথাক্রমে : শান্তনু, সুদেষ্ণা, সিদ্ধার্থ ও সুস্মিতা।

জ্যোতিরিন্দ্র কবিতা লিখতেন কলেজে পড়ার সময় থেকেই। তারপর বিষ্ণু দের মারফত ঘনিষ্ঠ হন 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে এবং ঐ পত্রিকাতে তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রথমে 'ত্রিশঙ্কু' ছদ্মনামে ও পরে স্বনামে কবিতা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া 'জনযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা', প্রভৃতি তখনকার বহু পত্রিকায় এবং দিল্লী প্রবাসকালে দিল্লীর 'ইন্দ্রপ্রস্থ', 'অজন্তা', 'দিগন্ত' প্রভৃতি বহু পত্রপত্রিকাতেও তাঁর নানা লেখা ছড়িয়ে আছে। ১৯৪২ সালে প্রথম থেকেই তিনি 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা কালেও তিনি ঐ সংঘের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন ১৯৪২ সালে।

জ্যোতিরিন্দ্রের কবিতা ও গান যথাক্রমে পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয়েছিল এই ভাবে : 'মধুবংশীর গলি', 'নবজীবনের গান' (স্বরলিপি-সহ), 'রাজধানী ও মধুবংশীর গলি' এবং 'যে পথেই যাও'।

গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় দলের আন্ধেরির আস্তানার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন, বিনয় রায় প্রমুখের সঙ্গে। ১৯৫০ সালের পর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন বোকারোর এক স্কুলে। তার পর ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় স্থায়ীভাবে দিল্লীপ্রবাসী হন। সেখানে 'সংগীতনাটক অকাদেমী' ও 'ভারতীয় কলাকেন্দ্র'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সংগীত প্রযোজনা করেন 'রামলীলা'র। সেখানে থাকার সময় সুকুমার রায়ের 'লম্বকর্ণ পালা'তে সুর দেন এবং তারপর বিষ্ণু দের 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতের' কবিতায়। চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য সংগীত পরিচালনা : 'কাঁচের স্বর্গ', 'কুমারী মন', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কোমল-গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', তথ্যচিত্র 'আমার লেনিন' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'।

১৯৭৪ সালে তিনি আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। এখানে 'পাঠভবন' ও 'কমলা গার্লস স্কুলে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছোটোদের জন্য কয়েকটি গান রচনা করেন এবং 'আবোলতাবোল' 'লালকালো', 'সে' এবং ক্ষিতীশ রায় রচিত 'কুড়ুনী' প্রভৃতিতে সুর যোজনা করেন।

২৫ অক্টোবর ১৯৭৭ হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পথে ট্রেনেই আকস্মিকভাবে

তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাইয়ের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (IPTA) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে যে বুলেটিন বেরিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল :

> 'Indian Peoples' Theatre Association has been formed to co-ordinate and strengthen all the progressive tendencies that have so-far manifested themselves in the nature of drama, songs and dances''

১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

১৯৪৩ সালে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' তৈরির পর দেশের নানা জায়গায় ধীরে ধীরে শাখা সংগঠন তৈরি হতে থাকে। বাংলায় গণনাট্য সংঘ তৈরি হতে খানিকটা সময় লেগেছিল। ১৯৪৫ সালে 'গণনাট্য সংঘ' তার কাজ শুরু করে। একেবারে প্রথমে, মন্বন্তরের সময়, সেন্ট্রাল স্কোয়াডে বাংলার একদল শিল্পী ছিলেন যারা পাঞ্জাব ও বোম্বাই গিয়েছেন। বাংলাদেশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে 'পিপলস রিলিফ কমিটি'কে দিয়েছেন। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে কাজ করতে থাকল।

বাংলা নাটকের স্রোতধারায় এক স্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকল বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন'। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছে। বাংলায় গণনাট্য সংঘের সূচনায় প্রথম সর্বক্ষণের সংগঠক ছিলেন সুধী প্রধান। ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সঙ্গীতের যে শাখা তৈরি হয়েছিল, এমন সম্মিলন ভারতের ইতিহাসে আর কখনও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। নামগুলো আমরা পরপর লিখছি :

বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরিপদ কুশারী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার, সাধনা রায়চৌধুরী, ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, নিবারণ পন্ডিত, শচীন দেববর্মন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও আরও অনেকে।

সংগীত ছাড়া নাটক এক পা-ও কি এগোতে পারে? দুই বিভাগের শিল্পীদের তাই প্রায় সময়েই একসাথে কাজ করতে হয়। নাটকের বিভাগে যাঁরা ছিলেন : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, নিমাই ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, রেবা রায়, মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম ও আরও অনেকে।

যে মানুষদের নাম আমরা লিখেছি , তাঁদের প্রায় সকলেই দেবব্রতর কম

বেশি স্মৃতিচারণা করেছেন। আন্দোলনের দিনগুলির রোজনামচা জানিয়েছেন। পরে দেবব্রতর কাছে যাঁরা গান শিখতে এসেছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণা কখনই আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণের মতো হতে পারে না। দুই প্রজন্মের সাহচর্যের প্রকৃতি আলাদা। অনুভূতিও আলাদা। সকলের অনুভূতি পাঠকের দরবারে পৌঁছুতে পারব না। কয়েকজনের কথা নিশ্চয়ই বলব।

শুরুতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গীত বিভাগের দলনেতা ছিলেন বিনয় রায়। বাংলার বাইরের মানুষেরা বলতেন 'গোল্ডেন ভয়েস' বিনয় রায়। সাংগঠনিক কাজ যে চারজন মিলে আলোচনা করে ঠিক করতেন তাঁরা হলেন সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' শুরুর দিন থেকেই নাটক গান নৃত্য ও আবৃত্তির উপর জোর দেয়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা 'মধুবংশীর গলি' কবিতাটি শম্ভু মিত্র এক বিস্ময়কর উচ্চতায় নিয়ে যেতেন। ১৯৪৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রথম বড়োমাপের অনুষ্ঠান হয়েছিল। দশটি জেলা থেকে গানের শিল্পী নিয়ে এসেছিলেন বিনয় রায়।

'নবান্ন' নাটকের কথা বিশেষ বলব না। শুধু এইটুকু বলব, দেবব্রতর ছোটো বোন ললিতা এই নাটকে 'বাংলার ম্যাডোনা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ললিতা ভালো অভিনয় করতেন। জনৈক গবেষক লিখেছেন, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তিনটি স্কোয়াড খুবই কর্মবহুল ছিল। ড্রাম স্কোয়াড, ব্যালে স্কোয়াড আর মিউজিক স্কোয়াড। মিউজিক স্কোয়াডের শিল্পীরা প্রত্যেকটি ড্রামা স্কোয়াডের সঙ্গে নাটকাভিনয় শুরু হওয়ার পূর্বে সংগীত অনুষ্ঠান করত। সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, ওমর শেখ, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, ভূপেন হাজারিকা, দেবব্রত বিশ্বাস...প্রমুখেরা সমগ্র বঙ্গদেশে ও ভারতের নানা প্রান্তে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। কথা, সুর এবং গায়ন ভঙ্গির নতুনত্ব প্রচলিত সংগীতধারাকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রেম ও মন দেওয়া-নেওয়ার আবেগসর্বস্ব গানের বিষয়বস্তুর জায়গায় এসে গেল নতুন বিষয়বস্তু। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে শোষিত মানবের মুক্তির জয়গান, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়...নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ও সংগ্রাম, সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন-সংগীতের বিষয়বস্তুর মধ্যে এসবই এসে গেল।' তেভাগা আন্দোলনে লেখা হল একের পর এক কালজয়ী গণসংগীত। বিনয় রায় লিখলেন, 'অহল্যা মা তোমার সন্তান জনম নিল না'র মতো গান। সুর দিলেন সলিল চৌধুরী। সলিল চৌধুরী নিজেও একাধিক চিরজীবী গান রচনা

করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন। তাঁর 'মাউন্টব্যাটেন কাব্য' মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। শোষণ আর লাঞ্ছনার সঙ্গী হয়ে যেমন শিল্পীরা রচনা করেছেন একাধিক গান, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তেমনি সঙ্গীতের ঐতিহ্যকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছে। নিজেদের গানের পাশাপাশি তাঁরা অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, মুকুন্দ দাস ও অবিশ্যিই রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন।

গানের মুখ্য শিক্ষক ছিলেন বিনয় রায়। তাছাড়া দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ভূপতি নন্দী ও সুরপতি নন্দী গান শেখাতেন। দেবব্রত বিশ্বাসের ১৭৪ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে সঙ্গীতের মহড়া হত। তখন আর ৪৬ নম্বরে হত না। দিলীপ রায়, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, ভূপতি নন্দী, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় গান গাইতেন।

কে অবহেলা করবেন সেই সুবর্ণ সময়? গান লিখছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী। লিখছেন না শুধু, সুর দিয়ে নিজেরা গাইছেন। গায়ক হিসাবে গান গেয়ে হাজার হাজর মানুষকে মাতিয়ে দিতেন দেবব্রত বিশ্বাস। দেবব্রত বিশ্বাসকে তাঁর কণ্ঠ ও গায়নভঙ্গির জন্য বাংলার 'পল রোবসন' বলা হত। এছাড়াও গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে গান গেয়েছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, সুখেন্দু গোস্বামী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় (মিত্র)। পঙ্কজ মল্লিক ও সন্তোষ সেনগুপ্তের কথা আগে বলেছি। লোকগানে ছিলেন টগর অধিকারী, নিবারণ পণ্ডিত, সাহেব আলি (আগরতলা), নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী ও ব্রজেন বিশ্বাস (কুমিল্লা)।

গণনাট্য সংঘের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের নাম জড়িয়ে আছে। সেটি একটি ছায়ানৃত্য। নাম 'শহীদের ডাক'। আলমোড়ায় উদয়শঙ্করের নৃত্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এসে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের নিয়ে তৈরি হয় ছায়ানৃত্য 'শহীদের ডাক'। বলা দরকার, খালেদ চৌধুরীর তৈরি করা একটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছায়ানাটকের প্রযোজনা দেখে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন সংঘকে ছায়ানৃত্য নির্মাণে উৎসাহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায় বেড়াতে গিয়ে ছায়ানৃত্য দেখে খুশি হয়েছিলেন। অনেকের অভিমত, ছায়ানৃত্য 'শহীদের ডাক' সে সময় অনেকটাই ধর্মবিদ্বেষ ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। 'নবজীবনের গান'-এর সুরসৃষ্টিতে কতোটা অবদান দেবব্রতের আর কতটা জ্যোতিরিন্দ্রের, আমরা যেমন বুঝতে

পারি না, 'শহীদের ডাক' ছায়ানৃত্যের বেলাতেও ঘটনা একইরকম। তবে অনুমান, এর গান ও চিত্রনাট্য রচনায় তিনজনের অবদান রয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাস, মৃণাল সেন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('গণনাট্য কথা'-সজল রায়চৌধুরী, মে ১৯৯০) ভিন্নমতও দেখা যায়। সুধী প্রধানের মতে অনেকে মিলেই করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞান মজুমদার, অনাদি প্রসাদ, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও আরও কেউ কেউ ছিলেন। যে কথা বলতেই হয়, দেশের রাজনৈতিক পটভূমি বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের চিত্রনাট্যও বদলেছে। গান ও নাচ বদলেছে। সে সব বিস্তারিত আলোচনায় যাবার জায়গা এটা নয়। পরিবেশনার সময় যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা হলেন :

নৃত্য : অনাদি প্রসাদ, শম্ভু ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে ।

গান : কলিম শরাফী, ভূপতি নন্দী, বিনয় রায়, প্রীতি সরকার, দেবব্রত বিশ্বাস ও আরও অনেকে। খালেদ চৌধুরী আর জ্ঞান মজুমদার নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। ঢোল, ড্রাম, ঝাঁঝ, মাদল ও বাঁশি বাজানো হতো। খালেদ চৌধুরী অসাধারণ আবহসঙ্গীত রচনা করতেন নিতান্ত সাধারণ নানা জিনিস দিয়ে।

১৯৪৩-১৯৪৫ এই তিনটি বছর পৃথিবীতে বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে এদেশে বিস্ময়ের পর বিস্ময় তৈরি করেছে। ১৯৪৬ সাল থেকে কেমন যেন একটা স্তিমিত ভাব দেখা যেতে লাগল। মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ আর মহাযুদ্ধে মানুষের যে ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছিল, শিল্পীরা তাঁদের ভাষায় সে সংকট ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্য স্বল্পায়ু হয়েছে কেননা কেউ কেউ মনে করেন, গণনাট্য সংঘে ছিল শ্রমিক ও কৃষকের অভাব। সবটাই মধ্যবিত্ত। বলতে গেলে উচ্চমধ্যবিত্ত। সেই আন্দোলন বেশিদিন বেঁচে থাকবে কেন? একথা বলেছেন সলিল চৌধুরী। বিজন ভট্টাচার্য অভিযোগ তুলেছিলেন, 'মানুষের চাইতে কেরিয়ারিস্ট বেশি ছিল'। কলকাতার বানিজ্যিক থিয়েটার হলের মালিকরা গণনাট্য সংঘের নাটককে হল ভাড়া দিতে চাইছেন না। অনেকে আবার অতো কষ্ট করে গ্রামে-গঞ্জে নাটক করতে যেতে চাইছিলেন না। নিজেদের মধ্যে শিল্পীদের ভাগাভাগি হতে থাকল। বিনয় রায়, বিজন ভট্টাচার্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে চাইছেন। শিল্পের উৎকর্ষের খানিকটা খামতি হলেও বড়ো কাজের অভিপ্রায়েই গ্রামে যেতে হবে। শম্ভু মিত্র প্রমুখ শিল্পকলার উৎকর্ষ নিয়ে 'ছেলেখেলা' করতে রাজি নন। এই লেখায় আমরা 'কার দোষ কার গুণ' এমন আলোচনায় যাব না। যে ঘটনা সত্যি, এর ফলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনা ও অন্যান্য কর্মকান্ড অনেকটাই পঙ্গু হয়ে পড়েছিল।

এসব 'ভাগাভাগি' দেখে দেবব্রত ঠিক করেছিলেন, তিনি কোনোদিকেই ঝুঁকবেন না। শম্ভু মিত্রের কথা বলা হচ্ছিলই যখন, 'রক্তকরবী'র কথা বলা যাক। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা ও অভিনয়ে 'রক্তকরবী' বাংলা নাটকের সমগ্র ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জায়গা করে নিয়েছে। 'বহুরূপী' এই নাটক ১৯৫৪ সালে অভিনয় করেছিল। তার কবছর আগে শম্ভু মিত্র নন, নাটকটি পরিচালনা করেছেন দেবব্রত বিশ্বাস। পরিচালক হবার আগে ১৯৪৭ সালে ৬-৭ অক্টোবর 'কালিকা' সিনেমা হলে 'গীতবিতান'-এর আহ্বানে 'রক্তকরবী' নাটকে 'বিশুপাগল'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' থেকে নাটকটি শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয় হয়েছিল। শম্ভু মিত্র 'বিশুপাগল' এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কণিকা মজুমদার-নন্দিনী। তৃপ্তি মিত্র-চন্দ্রা। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়-সর্দার। সজল রায়চৌধুরী-গোঁসাই। খালেদ চৌধুরী মঞ্চ সাজাতেন। সালটা ১৯৪৯ হবে।

কলকাতার কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্বের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ১৯৪৯ সালে দেবব্রত পরিচালিত 'রক্তকরবী' ও পাঁচবছর পরে ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্র পরিচালিত 'রক্তকরবী'র তুলনামূলক বিচার কি কোথাও হয়েছিল? বেরিয়েছিল কোথাও? কোনো আলোচনা সভা? সকলেই বলেছেন, তেমন কিছু তাঁদের চোখে পড়েনি। 'বহুরূপী'র প্রযোজনা নিয়ে জানতে চাইলে লেখার অভাব নেই। শুধু 'বহুরূপী' পত্রিকার নানা সংখ্যাতেই এর অনেক আলোচনা রয়েছে। তুলনা করে লেখা তো ১৯৫৪-এর আগে বেরোবে না। ১৯৪৯-এর প্রযোজনা নিয়ে দু-একটা আলাদা লেখা কি তৈরি হতে পারত না? হল না কেন? গণনাট্য সংঘের কথা শেষ করার আগে একটা বিষয় বলতেই হবে। আমরা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাস লিখতে চাইনি। এই সংঘে কয়েকটি বছর কেমন করে সকলের সঙ্গে বেঁচেছিলেন দেবব্রত, তার একটা রেখাচিত্র পেতে চেয়েছিলাম। সে কাজটুকু সাধ্যমতো করেছি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে বিনয় রায় ও রেবা রায় যে ভূমিকা পালন করেছেন, আমরা কখনো তা ভুলতে পারব না। রেবা রায়ের কথা বলতে গিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে সমান পারদর্শিনী ও কীর্তিময়ী এমন আর কোনো শিল্পী বাংলার গণনাট্য আন্দোলনে আমরা পাইনি। 'দেবী গর্জন' নাটকে তিনি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্ট 'গিরি' চরিত্রটি অসামান্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলতেন। মৃণাল সেন ও সন্দীপ রায় তাঁকে দিয়ে 'পরশুরাম' ও 'হিমঘর' চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়েছেন। গণনাট্য সংঘের প্রবাদ প্রতিম যুগে বাংলার মন্বন্তরের হাহাকার তিনি ও বিনয় রায় পরিবেশন

করেছেন অভাবনীয় দক্ষতায়। 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' তার উদাহরণ। 'ম্যায় ভুখা হুঁ' দ্বিতীয় উদাহরণ।

রেবা রায়ের জন্ম রাজশাহীতে। বাবা অতুলকৃষ্ণ রায় ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। কংগ্রেস করতেন। মায়ের নাম হেমলতা দেবী। চার ভাই-বোন। দিদি ইলা নন্দী, দুই দাদা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ। বিনয়কৃষ্ণই পরে বিনয় রায় হিসেবে সকলের পরিচিত হয়ে ওঠেন। চার-পাঁচবছর বয়সে রেবা তাঁর মাকে হারিয়েছেন। তখনকার যা নিয়ম। ইস্কুল-কলেজ ছাড়া মেয়েরা বাড়ির বাইরে আর কোথাও যাবে না। বাড়িতে রাজনীতি অচ্ছুৎ ছিল না। পুলিশ বার কয় এসেছে। বাবা কিন্তু গান বাজনা পছন্দ করতেন না। রেবা রায় বলেছেন, 'আমরা দুজনেই (রেবা ও বিনয়) কেউই সেভাবে গান শিখিনি।'

ইতিহাসে লেটার পেয়ে রেবা ম্যাট্রিক পাশ করেন ও রংপুর কলেজে ভর্তি হন। দাদাদের কাছ থেকে বামপন্থী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কলেজে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। মেয়ের এসব কাজ বাবা পছন্দ করতেন না। ধীরে ধীরে রেবা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-র সদস্যা হলেন। এল ১৯৪৩ সাল। মন্বন্তরের শোকে ছেয়ে গেল বাংলার আকাশ বাতাস। সমিতির পক্ষ থেকে ক্ষুধার্তদের ত্রাণে দিনরাত খাটছেন সকলে। রেবাও তাঁদের একজন ছিলেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই বক্তৃতায় দক্ষ হয়ে উঠলেন। গানও গাইতে শুরু করলেন। মানুষ কি সবকিছু হিসেব করে শেখে? সময় মানুষকে শিখিয়ে নেয়। ১৯৪৩ সালে আঠারো বছর বয়সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে রেবা রায় পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। ওই বছরেই কলকাতায় 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনে' নৃত্য পরিবেশন করেন।

রংপুর ছাড়তে বাধ্য হলেন রেবা। 'ছোড়দা' (বিনয় রায়) তাঁকে নিয়ে এলেন। 'সরোজদা-কনকদিদের' কমিউনে উঠলেন। বিনয় রায়ও সেখানেই থাকতেন। সংস্কৃতি আন্দোলনে পুরোপুরি ডুবে গেলেন। পাঞ্জাবে হিন্দি নাটক 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নিয়ে যাওয়া হল। বিনয় রায় ও ভূপতি নন্দী ছিলেন। এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। ১৯৪৪ সালে গেলেন বোম্বাই। 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' পরিবেশিত হল। রেবা গাইলেন। নাচলেন। সরোজিনী নাইডু দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। রেবার হাত ধরে বলেছিলেন 'এক্সেলেন্ট'। অভিনয় শেষে পৃথ্বীরাজ কাপূর, ভি শান্তারাম ও আরও অনেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন। কুড়ি হাজার টাকা উঠেছিল।

১৯৪৪ সালের শেষদিকে বোম্বাইয়ের আন্ধেরীতে কমিউন করে থাকতে

শুরু করলেন। 'সেন্ট্রাল কালচারাল স্কোয়াড' করতে হবে। সেখানে অনেকেই আসতেন। একটা মজার কথা লিখেছেন রেবা রায়। একবার শম্ভু মিত্র ও বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) এসেছেন। শান্তি বর্ধন বললেন, যেই থাকে এখানে, সকালে ব্যায়াম করতে হবে। 'ভয়ের চোটে শম্ভুদা আর বটুকদা পরের দিনই বম্বে চলে গেলেন।' আন্ধেরীতে তখন শিল্পী চিত্তপ্রসাদও থাকতেন। রেবা রায় জানিয়েছেন আমাদের, কিভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতীক তৈরি হয়েছিল।

> 'একদিন সন্ধেবেলায় হলঘরে বসে সেলাই করছিলাম। একপাশে রাখা ছিল বিরাট নাকাড়াটা। হঠাৎ চিত্তপ্রসাদ বললেন, শান্তিদা, আপনি ওই ড্রামটার পিছন থেকে আস্তে আস্তে নাচের ভঙ্গিতে উঠে পোজ দিয়ে দাঁড়ান তো! শান্তিদা মহান শিল্পী। ড্রাম বাজাবার দুটো কাঠি নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে ড্রামের পিছন থেকে উঠে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ড্রাম বাজাবার পিছন থেকে উঠে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ড্রাম বাজাবার মুভমেন্ট করতেই চিত্তদা হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, শান্তিদা, দুমিনিট এই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকুন, একদম নড়বেন না! চিত্তদার তুলি বিদ্যুৎগতিতে এঁকে চলল, বিশাল ড্রাম বাজাচ্ছেন এক শিল্পী! বলে উঠলেন, এটা হল 'কল অব দ্য ড্রাম'। ছোড়দা (বিনয়) বলল, 'চমৎকার! শান্তিদা! চিত্তদা! এটাই হোক আই পি টি-এর প্রতীক।'

'কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপ' তৈরি হল। ওখানে তখন গাইতেন 'গোল্ডেন ভয়েস' বিনয় রায় আর 'বিস্ময় ছড়ানো কণ্ঠের অধিকারিণী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় (সরকার)।' তাদের গান অতি বড়ো শিল্পীকেও অবাক করেছিল। দিলীপকুমার রায় বলেছিলেন, 'শুধু তানপুরা সম্বল করে ভিন্ন ভিন্ন রসের, সুরের ও তালের গান এর আগে কোনো বাঙালি মেয়েকে গাইতে শুনিনি।'

আগে আমরা যে 'শহীদের ডাক' ছায়ানৃত্যের কথা বলেছি, রেবা রায়চৌধুরীও তার কথা বলছিলেন। কী মজা করতেন দেবব্রত বিশ্বাস, সে কথাও বললেন। চারপাশে দাঙ্গা আর খুনোখুনির আবহাওয়া। জর্জদা খালেদ চৌধুরীর নাম দিলেন কালী চৌধুরী। কলিম শরাফীর নাম কল্যাণ। খালেদ চৌধুরীকে একদিন আসতে দেখে জর্জদা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'কালী আইছে, কালী আইছে'। কে কালী? দেবব্রত তখন সবাইকে বোঝালেন। খালেদকে কেন 'কালী' বলতে হবে। কলিমকে কেন 'কল্যাণ' বলতে হবে। দাঙ্গাবাজেরা হিংস্র জন্তুর চেয়েও খারাপ। এদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে সবরকমের সতর্কতাই রক্ষা করতে হয়।

দেবব্রতকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন রেবা রায়। তিনি লিখেছেন, কলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টি আবার বেআইনি হয়েছে। দলেও সঠিক লাইন কোনটি এনিয়ে ভাগাভাগি চলেছে। এসময় গণনাট্য সংঘেরও কর্মকর্তা বদল

হল। আগের নেতারা অনেকেই নেতা রইলেন না। নতুন অনেকে দায়িত্ব পেলেন। সেই দলে আছেন সাধনা রায়চৌধুরী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ কুশারী, ভূপতি নন্দী, সজল রায়চৌধুরী, মমতাজ আমেদ খাঁ, জীবন মুখোপাধ্যায় ও রেবা রায়চৌধুরী। পার্টি বেআইনি। কিছু মানুষ বেআইনি 'আইন' মানবেন কেন? মৃণাল সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজনের বাড়িতে তখন সভা হয়েছে। রেবা রায়চৌধুরীর লেখা থেকে শুনুন :

> 'দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জদা) ছিলেন গণনাট্য সংঘের একান্ত সুহৃদ। তাঁর ১৭৪ই রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাড়িটা আজও বুকের মধ্যে আঁকা রয়েছে। তাঁর বাড়িতেই সকাল বিকেলে রিহার্সাল। সময় অসময়ে সংঘের অফিস। দুঃসময়ে আশ্রয়। অভাব অনটনে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য। অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতেন, টানাপোড়েনের দিনে জর্জদা আর বিয়্যা করনের সময় সজল। এমন সন্ন্যাসীপ্রতিম শুভাকাঙ্ক্ষী সংগীত-অন্ত প্রাণ বিশ্ব জুড়ে দেখিনি কখনও। একদা মহাচীনে জর্জদার গান এবং নাম ছড়িয়ে পড়েছিল—হিন্দী চীনী ভাই ভাই।'

পার্টি সভ্য দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন কা ছিলেন না সে ভিন্ন প্রশ্ন। সংকটের সময়ে নির্ভীক জর্জদা। কলকাতায় বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে নাটক হবার কথা। প্রকাশ্য সম্মেলন বেআইনি ঘোষিত হল। ঠিক হল, নাটক হবে না, সমাবেশ হবে। 'মনুমেন্টের তলায় গণনাট্য শিল্পীদের গান গাইতে ডাকা হচ্ছে। কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাবো কি যাবো না ভাবছি। এমন সময় দেখি দেবব্রত বিশ্বাস মাইকের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি গান ধরলেন—হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান—'মাউন্টবেটন সাহেবও, তোমার সাধের বেটন কার হাতে থুইয়া গেলা ও'। সীমা দাসের নিবন্ধটি দেখলে শিল্পীর সাহসিকতার আরও পরিচয় পাবেন।

কতো বড়ো মনের মানুষ যে ছিলেন দেবব্রত তা বলে শেষ করা যায় না। রেবা রায়চৌধুরী চলে যাবার অল্প কিছুদিন আগে তাঁর সহযোদ্ধাদের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। তারই সংকলন বলা যায়, 'জীবনের টানে শিল্পের টানে'। খালেদ চৌধুরীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, গণনাট্য সংঘের একজন স্টলওয়ার্ট খালেদ চৌধুরী। গণনাট্য সংঘের শ্রেষ্ঠ গায়িকা প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ জীবনে মস্কো চলে যেতে হল। স্বামী রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাডভোকেট ছিলেন। অকালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। রেবা রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'আমাদের যাঁরা বিপদের দিনে বন্ধু ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন রমেন দা। কমিউনিস্ট, সেই জন্যে এইচ. এম. ভি. প্রীতির গান রেকর্ড করেনি। তার প্রতিবাদে দেবব্রত বিশ্বাসও দীর্ঘদিন ওই কোম্পানিতে রেকর্ড

করেননি।' বেআইনি যুগে প্রীতি জেলও খেটেছিলেন।

এবছর দেবব্রত বিশ্বাসের জন্মশতবর্ষ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রেরও জন্মশতবর্ষ। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তিন 'প্রচারক' বাংলায় জন্মেছিলেন। শান্তিদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। আমাদের মনে রাখতে হয়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসও ২০১১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কে রেবা রায়চৌধুরী বলেছেন :

'গণনাট্য সংঘের সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে সবার সেরা বটুকদা, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এই আত্মভোলা মানুষটি দেশি, বিদেশি সংগীতে, উচ্চাঙ্গ ও লোকশিল্পেও ছিলেন প্রাজ্ঞ। বাণিজ্যিক কলাকৌশল ও লেনদেনের ধার ধারতেন না। গানের জন্যে, দেশ জাগাবার জন্যে, শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করার মানসে আত্মনিবেদন করেছিলেন। শেষ জীবনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে।...বটুকদা আযৌবন কমিউনিস্ট ছিলেন, কমিউনিস্ট জীবন যাপন করেছেন। উর্মিলা বৌদি শিশুর মতন এই শিল্পীকে ছায়ার মতন অনুসরণ করেছেন। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসার পথে রেল কামরার বাংকে আত্মীয়স্বজনের অলক্ষ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জীবনাবসান হয়।' আগে আমরা চিন্মোহন সেহানবীশের জীবনকথা দিয়েছি। সঙ্গে এটুকু যোগ হল।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীতবেত্তা নিয়ে বলেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। 'স্মৃতিসম্পুট'-এ লিখেছেন ইন্দিরা দেবী :

> 'আমার ইচ্ছে ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ওরফে বটুককে আনিয়ে (ওই) গানটা গাওয়ানো, বর্ষামঙ্গলেও তার গান এঁদের শোনানো; কারণ রবীন্দ্র-সংগীত সে বেশ ভালো গায় ও অনেক জানে। কিন্তু আশ্রমিক ব্যাপারে বাইরের লোক আনা কর্তৃপক্ষের তেমন মত দেখলুম না। দেখি, পরে কোনো সুযোগ ঘটে কিনা।'

গণনাট্য আন্দোলনে বিনয় রায় কী ভূমিকা পালন করেছেন তা আমাদের কাছে বারবার উঠে এসেছে। যেমন তিনি সংগঠক, তেমনি তিনি সুরশিল্পী। 'গোল্ডেন ভয়েস' তাঁর অধিগত। এমন করে সে কেন মারা গেল? ১৯৭৫ সালে সোভিয়েতের মস্কো শহরে একটি পেপার পড়তে গিয়েছিলেন। বিনয় রায় জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ভাষা বিভাগে ছিলেন। ৩রা জুলাই বাসায় ফেরার সময় গাড়ি চাপা পড়ে নিহত হন। কলকাতার মুক্তাঙ্গণে স্মৃতিসভা হল। কারা কারা এসেছিলেন সেদিন, একবার দেখে নিন

পাঠক। সজল রায়চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি নন্দী, মন্টু ঘোষ, রেবা রায়চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস। কয়েকজন মিলে বিনয় রায়ের কয়েকটি নির্বাচিত গান গাইলেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গাইলেন 'নবজীবনের গান'। বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকের গান গাইলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাইলেন, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সেই বিখ্যাত গান, 'নভমে পতাকা নাচত হ্যায়'। শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেন 'মধুবংশীর গলি'। সমবেত সঙ্গীত হল। 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা'। পাশে দাঁড়ালেন দেবব্রত বিশ্বাস। শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে, এমন দিন কি আর ফিরে আসবে না? এমন দিন তো নিজে নিজে আসে না। মানুষকেই আনতে হয়। সে আশা ছাড়িনি।

সুর-স্বর-স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বাধীনতা

দেবব্রত বিশ্বাসের নাম আলোচনায় এলেই রবীন্দ্রনাথের গানে সুর স্বর ও স্বরলিপির কথা উঠে আসে। শিল্পী কি সত্যি রবীন্দ্রনাথ যা চাইতেন তা মানেননি? স্বরলিপির বেলাতেও কি তিনি নিয়মভঙ্গ করেছেন? রবীন্দ্রসঙ্গীতে কী কী বাদ্যযন্ত্র থাকবে, সে বিষয়ে কি শিল্পী সচেতন নন? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা দুজন যোগ্য মানুষের দুটি নিবন্ধের শরণাপন্ন হব। একজন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যজন অমিতাভ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের বহু গান আছে যার একাধিক স্বরলিপি দেখা যায়। এমন বিভ্রান্তি কিন্তু নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নয়। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষকেরাও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। পরিবেশিত নিবন্ধে তার সম্যক পরিচয় মিলবে। নিবন্ধ দুটিতে যাওয়ার আগে আমরা বিশ্বভারতী সঙ্গীত পর্ষদ বা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কথা খানিকটা জেনে নেব। রবীন্দ্রগবেষক অনুত্তম বিশ্বাসের এই বিষয়ে একটি লেখা পড়ছিলাম। সেই লেখায় তিনি বিশ্বভারতী সঙ্গীত পর্ষদের জন্ম ও নিয়মাবলী বিষয়ে পাঠকবর্গকে অবহিত করেছিলেন।

১৯৪২ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও অনাদিকুমার দস্তিদারের মিলিত আয়োজনে 'বিশ্বভারতী সঙ্গীত পর্ষদ' তৈরি হল। কেন এই পর্ষদ? শিল্পীরা যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ও গায়নভঙ্গী অবিকৃত রাখেন।

কী নিয়ম ছিল তখন? কেউ গান করলে তঁর স্যাম্পল ডিস্ক বিশ্বভারতী সঙ্গীত পর্ষদ-এ পাঠানো হত। সঙ্গীতভবনের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তিনি রেকর্ডটি বাজিয়ে শুনতেন ও তাঁর অভিমত জানাতেন। সব কথা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানতে হত। এরপর অনুত্তম বিশ্বাসের রচনা থেকেই পড়ুন :

> ১৯৬১ সালের ৩রা জুন রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তারপরেই শোনা যায়, তাঁর সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রতিমা ঠাকুর ও মীরা চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মামলা শুরু হয়েছিলো। রবীন্দ্রসংগীত যেহেতু তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাই ঐ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বভারতী ঐ সম্পত্তিটিকে

নিজস্ব আওতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিলেন না। প্রতিমা ঠাকুর এই মামলায় জিতলেন। এবং ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউজিক বোর্ডকে ঢেলে সাজানো হয়।

আপাতত স্বীকার করি, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত মিউজিক বোর্ডের কার্যধারার আসল কোনো তথ্যই আমার হাতে নেই। মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরই বোঝাতে পারতো একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস। যেমন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কে? গান বিষয়ে তাঁর প্রতিভা তো দূরের কথা, এমনকি বিশেষ উৎসাহ কি রুচির কোনো প্রমাণ—অনেক গবেষণা করেও—আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। রথীন্দ্রনাথ তাঁকে মিউজিক বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত করেছিলেন কেন? রথীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সের দীর্ঘ সময় যখন শান্তিনিকেতনের বাইরে দূরে ছিলেন, তখন মিউজিক বোর্ডের কাজকর্ম কে বা কারা দেখাশুনো করতেন? ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মিউজিক বোর্ডের সদস্য হিশেবে শান্তিদেব ঘোষের বা অনাদি দস্তিদারের কোনো ভূমিকা ছিলো কি? ১৯৫২ সালে শান্তিদেব ঘোষ সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? ১৯৬০ সালে শৈলজারঞ্জন সংগীতভবনের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসার পরও কি গ্রামোফোন-কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ শন্তিনিকেতনে স্যাম্পল ডিস্ক পাঠাতেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় অমি ৮ই মে '৭৪ তারিখে প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের ১০ নম্বর বাড়িতে যাই। ঐ বাড়িতেই মিউজিক বোর্ডের দশটা-পাঁচটা আপিশ বসে। বোর্ডের প্রধান কর্মী পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছেই আমি এই সব প্রশ্নের জবাব চেয়েছিলাম। তিনি প্রথমত 'কলকাতা' পত্রিকার তরফ থেকে এ ব্যাপারে লিখিত দরখাস্ত দাবি করেন। সেই দরখাস্তের ভিত্তিতে মিউজিক বোর্ডের সদস্যারা মীটিং করবেন। মীটিং-এ আলাপ-আলোচনার পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন 'কলকাতা' পত্রিকার সাংবাদিককে এই সব তথ্য জানানো যায় কিনা। আমাকে ফিরে আসতে হয় এবং ২১শে মে আবার আমি টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তিনি সেদিন জানালেন, 'এই সব গোপন তথ্য ছাপানো হোক, নৃপেনবাবু তা চান না।' 'কলকাতা'-সম্পাদকের জন্য একবার মেদিনীপুর জেলার ম্যাপ সংগ্রহ করতে গিয়ে, আমার এক সহকর্মীকে শুনতে হয়েছিলো যে এই সব সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলের ম্যাপ ওরকম যাকে-তাকে বিক্রি করা হয় না। তার জন্য দরখাস্ত করতে হয় রাইটার্স বিল্ডিং-এ। তবু তো মেদিনীপুর জেলায় হলদিয়া বন্দর, দু-চারটে সেতু ইত্যাদি আছে। কিন্তু বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড-এর ইতিহাসে নিশ্চয় বাংলা সংস্কৃতির প্রত্যেক ছাত্রের অধিকার; শান্তিদেব কবে, কেন বোর্ড ছেড়েছিলেন, কিংবা গ্রামাফোন কোম্পানির ডিস্ক কাকে পাঠানো

হয়, সে বিষয়ে গবেষণা বোর্ড বাধা দেবেন কেন? বরং এরকম প্রতিষ্ঠানের এক প্রধান লক্ষ্যই তো লুপ্ত তথ্যের রক্ষা?

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বভারতী কর্মসমিতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে একমাত্র ট্রাষ্টি করে, মিউজিক বোর্ডকে ঢেলে সাজালেন। অনারারি সেক্রেটারি হলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। এস. এ. মাসুদ, সুধীরঞ্জন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় (বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগের অধ্যক্ষ) ও শান্তিদেব ঘোষ যোগ দিলেন স্থায়ী সদস্য হিশেবে।

লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম আদি শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও অনাদি দস্তিদার বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করলেন না বা তাঁদের মনোনীত করা হলো না। যাঁদের নির্বাচিত করা হলো, তাঁরা সকলেই, একা শান্তিদেব বাদে, জাষ্টিস, অ্যাডভোকেট বা বিশ্বভারতী আপিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অবশ্য কর্ম সমিতি হয়তো ভেবেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গানের ওকালতি করাই আশুকর্তব্য। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানিকে—ওকালতি না করে—রেকর্ড বিক্রি করতে হবে। সেই সব রেকর্ডের গান কারা শুনবেন? কাজেই, মিউজিক বোর্ডের অ-গাইয়ে স্থায়ী সদস্যরা কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাকে পরীক্ষক হিশেবে বেছে নিলেন। এই পরীক্ষকরাই গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ফিতের গাঁথা গান শুনে বিচার করে থাকেন যে, গানটি যথাযথ গাওয়া হয়েছে কিনা। পরীক্ষকের সম্মতি ছাড়া রেকর্ড প্রকাশিত হয় না।

যাঁরা এক্সপার্ট কমিটির সদস্য, দেখছি, তাঁরা জনপ্রিয় গায়কও। এবং তাঁদেরও গানের রেকর্ড বাজারে বেশ ভালোই বিক্রি হয়। কাজেই বিচারক হলেও এঁরা সকলেই জনপ্রিয়তা অর্জন ও রেকর্ড বিক্রির ব্যাপারে অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত গায়কদের প্রতিদ্বন্দ্বী নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে, মিউজিক বোর্ডের এক্সপার্ট নন, অথচ অভিজ্ঞ সংগীতশিল্পী, এমন কেউ যদি এক্সপার্টদের মতামতে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহলে সেই সন্দেহকে যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি। একবার দেবব্রত'র দুটি গান—'মেঘ বলেছে যাবো যাবো' ও 'গোধূলি গগনে মেঘে' গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করতে পারেন নি। কারণ দেবব্রত বিশ্বাসের মেলোড্রামাটিক ভয়েস বোর্ডের কোনো একজন সদস্যকে পীড়া দিয়েছিলো। দেবব্রত সেই সময় মিউজিক বোর্ডের একজন কর্তাব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে বলেছিলেন, ইংরেজি মেলোড্রামাটিক ভয়েস কথাটির সঠিক অর্থ কি। সদস্যরা নিজেদের ভুল বুঝে পরিবর্তন করেছিলেন সিদ্ধান্ত। তারা মানে কোনো একজন পরীক্ষক মহাশয় দেবব্রত-র কণ্ঠস্বর

পছন্দ করেননি এবং তিনি অগণিত রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাকে তাঁর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্ভট অধিকার তাঁকে কে দিয়েছিলো?

এই সব সমস্যা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেতো, যদি রেকর্ড পাস করার সময় প্রত্যেক পরীক্ষক এক জায়গায় বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, গ্রামোফোন কোম্পানি গানের ফিতেটি মিউজিক বোর্ডের আপিশে পাঠিয়ে দেন এবং আপিশ থেকে ঐ ফিতে একজন পরীক্ষকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ একজনই মাত্র রবীন্দ্রসংগীতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

১৯৬৯ সালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রেকর্ড কোম্পানিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রারম্ভেই লেখা—'On the basis of the report received from the examiner who heard the tune...' ইত্যাদি। লক্ষ করুন—'the examiner'—অর্থাৎ একজন পরীক্ষককেই বোঝানো হয়েছে।

গান বিচার করবার সময় মিউজিক বোর্ডের সদস্য বা পরীক্ষককে কয়েকটি শর্ত মাপকাঠি তৈরি করে নিতে হয়, বা বলা ভালো অলিখিত ভাবে এই সব শর্ত অনেক দিন থেকেই আছে। যেমন, ছাপা স্বরলিপিকে আগাগোড়া অনুসরণ করে গান গাইতে হবে। '৬০ সালে দেবব্রত-র গান কতকটা এই কারণেও ছাড়পত্র পায়নি। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই নিয়ম লঙঘন করলে কোনো ক্ষতি নেই। নীলিমা সেনের গাওয়া 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' গানটির রেকর্ড অনুমোদন করেছিলেন মিউজিক বোর্ড, যদিও গানটির ছাপা স্বরলিপি নেই। কিন্তু ঋতু গুহ যখন সাহানা দেবীর গাওয়াকে অনুসরণ করে 'দিন ফুরালো হে সংসারী,' গাইলেন, সে গান অনুমোদিত হলো না। ঋতু গুহ শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের ছাত্রী না হয়েও 'কনফিডেন্টসি' গান গাইছেন বলে কি বোর্ডের সদস্যরা ভয় পেয়েছিলেন? এই ধরনের পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মিউজিক বোর্ড লিখিত নিয়ম জারি করলেন যে, ছাপা স্বরলিপি যে গানের নেই, রেকর্ডের জন্য সে গান গৃহীত হবে না।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের হুবহু সুর মনে রাখতেন না এবং কখনও গান গাইতেন না স্বরলিপি পাঠ করে। একজনকে একভাবে কোনো গান শিখিয়ে আবার যখন অন্যকে শেখাতেন তখনই সুরের একটু অদলবদল হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে, অমিতাভ চৌধুরী বিস্তারিত লিখেছেন।* সুতরাং,

---

* লেখাটি পরে দেওয়া হয়েছে।

বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই। কেবল সেই বহুবিতর্কিত গান—যাকে একজন বিশিষ্ট সমালোচক 'অরাবীন্দ্রিক' বলেছিলেন সেই 'যারা বিহার বেলায়' গানটি রবীন্দ্রনাথ অমিতা সেন ও শৈলজারঞ্জনকে শিখিয়েছিলেন। তা হলে আজ যদি একজন শিল্পী অমিতা সেন বা শৈলজারঞ্জনের কাছে গানটি শিখে রেকর্ড করতে চান, তাঁর রেকর্ড কি অনুমোদন করা হবে না, গানের ছাপা স্বরলিপি নেই বলে?

বিশ্বভারতীর স্বরলিপি দপ্তরও যে সর্বদা মৌলিক স্বরলিপি প্রচার করেছেন তাও নয়। যেমন, স্বরবিতান প্রথম খণ্ডের বর্তমান সংস্করণের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে স্বরলিপি পরিবর্তনের জন্য দায়ী করা হয়েছে শান্তিদেব ঘোষ ও অনাদি দস্তিদারকে। ১৯৭৩ সালে স্বরলিপি সমিতির অধিবেশনে শান্তিদেব এ-ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেই অধিবেশনেই প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও অন্যান্য সদস্যরা একমত হন যে বিজ্ঞপ্তিটির সংশোধন প্রয়োজন। অতএব, দেখা যাচ্ছে, স্বরলিপিরও পরিবর্তন করা হয় এবং এই পরিবর্তন বা সম্পাদনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় যার তার কাঁধে।

ছাপা স্বরলিপির ব্যাপারে শান্তিদেব ঘোষের সংশয়ের আর-একটি প্রমাণ আমি পেয়েছি। ১৯৬৪ সালে দেবব্রত বিশ্বাস 'এসেছিলে তবু আস নাই' গানটি রেকর্ড করার জন্য গেয়েছিলেন। মিউজিক বোর্ডের কোনো এক মহিলা-পরীক্ষক গানটি শুনে দেবব্রতকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছিলেন, তিনি গানটি ঐ সুরে শেখেন নি। পরে শান্তিদেবকেও দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া ঐ গানটির টেপ শোনানো হয়। তিনি শুনে দেবব্রতর স্বরলিপি গ্রন্থে লিখে দিয়েছিলেন, 'এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। আমার মনে হয়, ছাপার কোনো গোলমাল ঘটেছে।'

তবু স্বরলিপির মানদণ্ডে রেকর্ড অনুমোদনের ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকে না যদি শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সাহানা দেবী, অমিতা সেন, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরও যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বা দিনু ঠাকুরের ছাত্র-ছাত্রী এখনও বেঁচে আছেন, প্রত্যেকেই এক সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁদের শ্রুতিতে বা কাগজে যেসব স্বরলিপি আছে, সেগুলি জমা দেন স্বরলিপি দপ্তরে। চারজনের কাছে একটি গানের ভিন্ন ভিন্ন চার রকমের স্বরলিপি থাকলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। 'আমি চিনি গো চিনি' গানের আলাদা-আলাদা চারটি স্বরলিপি করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরাদেবী, সরলাদেবী ও শৈলজারঞ্জন। তা যদি হয়, তবে শৈলজারঞ্জন কৃত 'অধরা মাধুরী' গানটির স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরও শান্তিদেব একটু অন্য সুরে গাইলেন বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গানটি এই সুরে শিখিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

সবাই যদি রাজি থাকেন স্বরলিপি জমা দিতে, আর স্বরলিপি দপ্তরও যদি এক গানের একাধিক সুরান্তর গ্রহণ করতে আপত্তি না করেন এবং সবগুলি যদি ক্রমশ স্বরবিতানে ছাপা হতে থাকে তাহলে কোনোদিন স্বরলিপি নিয়ে আর লাঠালাঠি হবে না এবং বিভ্রাটও কিছুটা কমবে। নতুবা মিউজিক বোর্ড যেমন সাহানা দেবীর সুরে সংশয় প্রকাশ করেন, শৈলজারঞ্জনের ছাত্ররা যেমন শান্তিদেবের সুর নিয়ে অসন্তুষ্ট, তেমনি শৈলজারঞ্জনের কৃত স্বরলিপিও আজ তর্কাতীত ভাবে গ্রাহ্য নয়। শৈলজারঞ্জন যদি ১৩৪৮ সনের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী' গানটির স্ব-কৃত স্বরলিপি তেত্রিশ বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ করিয়ে আজ ১৩৮১ সনে হঠাৎ মনে করেন যে, গানের দ্বিতীয় পঙক্তির সুর একটু অন্যরকম হবে তবে আমাদের সন্দেহ হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিনি বলছেন, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপার ভুল হয়েছিলো। তেত্রিশ বছরে ধরে গানটি গেয়ে একবারও তাঁর ঐ ভুলের কথা মনে হয়নি?

কোনো রেকর্ড অনুমোদন করার সময় আরো বিবেচনা করা হয় যে, গানের ভাব ও সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে বাজনাগুলি বাজানো হয়েছে কিনা। এই প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ ২৮শে এপ্রিল '৭৪ তারিখে আমাকে বলেন, 'দেবব্রত বাবুর গান আটকে দেওয়ার পর আমি মিউজিক বোর্ডকে একটা চিঠি লিখেছিলাম যে আপনারা একটা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করছেন না কেন? সত্যজিৎ রায় ফিল্মে যে গান গাওয়ালেন, সে গানেও তো ওয়েস্টার্ন বাজনা বেজেছে। তখন আমি সাজেশন দিই, আপনারা লিখিতভাবে নিয়ম করুন, কী কী বাজনা বাজবে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে। আমিই একটা লিস্ট তৈরি করে দিই।'

শান্তিদেব ঘোষ কৃত বাদ্যবাজনার এই তালিকাটি মিউজিক বোর্ড গ্রহণ করলেন। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানি চিঠি মারফৎ জানতে পারলেন যে, শুধুমাত্র এস্রাজ, বাঁশি, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা, দোতারা, একতারা, বেহালা, বাঁশবেহালা, অর্গ্যান, পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা, খোল, ঢোল, মন্দির—এই কয়েকটি বাদ্যই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে বাজানো চলবে।

বেহালা চলবে, কিন্তু যে-পিয়ানো জ্যোতিদাদা বাজাতেন রবির গানের সঙ্গে সে পিয়ানো একেবারে নাকচ।

ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট চরিত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি জানতেন, বিশুদ্ধতা বলে যা প্রচার করা হয়, বাস্তবতার চিত্র ভিন্ন। সুরকার ও শিল্পীর ভূমিকা বিষয়ে

তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর-দলন' আয়তনে খানিকটা দীর্ঘ হলেও আমরা পুরো নিবন্ধটিই এখানে যোগ করব।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর-দলন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রষ্টার চেয়ে টীকাকারদের সংখ্যা যে বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। কেন না সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারণা, জ্ঞান ও প্রেরণা, আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও বেশীর ভাগ টীকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারদের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রুজির ক্ষেত্রে টীকাদারের ঠিকদারির ফাঁদ থেকেই বাঁচাই যেমন খেটে খাওয়া লোকের কাম্য, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীকাকারদের ঠিকদারির ঘূর্ণি থেকে বাঁচাই হচ্ছে রস-দরিয়ার ডুবুরিদের লক্ষ্য। এ হুঁশিয়ারিটা বিশেষ করে এ যুগে খুবই দরকার, কেন না শুধু যে খাদ্য অখাদ্যের ব্যবসায়ীরাই বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, জ্ঞান পণ্যের ও রসপণ্যের বণিকদের কোলাহলেও বাজার সরগরম। কিছু বেচতে গেলেই, খরিদ্দারদের সামর্থ্যের দিকে নজর দিতে হয়। রুচির বেশীর ভাগটাই হচ্ছে সামর্থ্য। বেশীর ভাগ লোক সামর্থ্যের অভাবে বেশী দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে পারে না। তাই ব্যাপারীকে পাঁচমিশালি মাঝারি জিনিষই বেশী করে আনতে হয় বাজারে। রসের ক্ষেত্রেও খুব উঁচু দরের রস-সৃষ্টির জন্যে যে মূল্য দিতে হয় সে মূল্য বেশীর ভাগ লোকের অন্তরের মঞ্জুষায় সঞ্চিত নেই। তাই রসপণ্যের যারা ব্যাপারী তারা যে খরিদ্দার বুঝে সেরা জিনিষটাতে ভেজাল মিশিয়ে মাঝারি করে বাজারে চালাতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা যে দুঃখের সেটা স্বীকার করতেই হবে। কেন না অন্নে ভেজাল যেমন সাংঘাতিক আঘাত হানে, মনের অন্নে কুশ্রীর ভেজাল, নীচু সুরের মিশ্রণ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আঘাত হানে না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই তাঁর সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিতে ভেজাল মিশানোর যে আসুরিক প্রয়াস চারদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় যে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এত অল্পদিনের মধ্যেই যখন তাঁর গানের এই মর্মান্তিক অবস্থা, আরও কিছু বছর বাদে খাদের প্রাচুর্য্যে ও পীড়নে তাঁর গানের সোনা হয়ত একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।

এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নন। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত হয় তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি বইয়ের নূতন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের কর্তৃপক্ষের

অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটেছে।

এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্য ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্য ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্মপ্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে তাঁদের সঙ্গীত বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজী নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন, দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়া ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকদের দ্বারা।

১। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এই গানটির স্বরলিপি ১৩৪২ সালে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'স্বরবিতানের' প্রথম খণ্ডে। ১৩৫৪ সালে স্বরবিতানের যে সংস্করণ বের হয় তাতে সুরটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৩৫৬ সালের সংস্করণেও এই বদলানো সুরটি বজায় রাখা হয়েছে। অশালীনতার পরাকাষ্ঠা এই যে, দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির বই হিসেবে 'স্বরবিতান' এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে।

২। 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে' এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের দিনেন্দ্রনাথ কৃত সংস্করণেও এই গানের সুরটি অবিকৃত থাকে। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপিটি অদলবদল করে দেওয়া হয়. অবশ্য এই ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি বলে সেটা চালানো হচ্ছে।

৩। 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানের সুরটিকে বদল করে ছাপানো হয়।

৪। 'কোথায় যে উধাও হোলো' গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণের সুরটি ওলট-পালট করে স্বরলিপি বের হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের উপর অসীম করুণা দেখিয়েও দিনেন্দ্রনাথের উপর কৃপা করে আবার ১৩৪৩ সালের সুরে ফিরে গেছেন এই মাতব্বরেরা।

৫। 'আমারে ডাক দিল কে' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে 'নবগীতিকা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন, ১৩৩৭ সালের সংস্করণেও সুরটি বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের অধীশ্বরদের কৃপা দৃষ্টি লাভ করে নি। 'নবগীতিকা'র ১৩৫৭ সালের

সংস্করণে সুরটির পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬। 'আমায় ভুলতে দিতে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে 'গীতলেখা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৪২ সালের সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিল। ১৩৬২ সালের সংস্করণে সুরটি বদলানো হয়েছে।

৭। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ 'বৈতালিক' স্বরলিপি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৩৫৫ সালের দ্বিতীয় সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিল, ১৩৬২ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ কৃত গানটির স্বরলিপির এমন পরিবর্তন করা হয়েছে যে তাঁর স্বরলিপি বাতিল করা হয়েছে বললেই সত্য বলা হবে।

৮। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির স্বরলিপি সংগীতবিদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের সুরটি বহু পরিবর্তন করা হয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এই গানটির স্বরলিপির পরিবর্তন দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যের দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ আজ নেই, তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যাথার্থ্য বিচার করবার উপায় নেই, কিন্তু যে 'অন্য'টির কথা বলা হয়েছে, সেই 'অন্য'টি কে, তাঁর কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছে করে, রবীন্দ্রনাথের ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটি প্রামাণ্য ধরা যেতে পারে। নূতন স্বরলিপির সংগে তার কোন মিল নেই।

৯। 'ওহে জীবন বল্লভ' ও 'প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী' এই দুটি গানের স্বরলিপি কাঙ্গালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্ম সংগীত' স্বরলিপি'তে (১৩১১, ১৩১৮ সালে) প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬ সালে 'স্বরবিতান' চতুর্থ খণ্ডে এই দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়। কাঙ্গালীচরণ সেনের স্বরলিপির সুর তখনও বজায় থাকে। ১৩৫৮ সালে স্বরবিতান-এর সংস্করণে এই দুটি গানেরই সুর বিকৃত করা হয়েছে।

১০। 'আজি বহিতেছে বসন্ত', মোরে বারে বারে ফিরালে', 'অন্তরে জাগিছ, অন্তর্যামী'—এই গানগুলির স্বরলিপি কাঙ্গালীচরণ সেন প্রকাশ করেন 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপিতে'। স্বরবিতান-এর ১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানগুলির সুর বদল করা হয়েছে।

১১। 'স্বরবিতান' প্রথম খণ্ডে চারটি সংস্করণের মধ্যে প্রথম সংস্করণে 'সে আমার গোপন কথা' গানটির অন্তরাতে 'প্রাণ আমার বাঁশী শোনে' ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'প্রাণ যে আমার বাঁশী শোনে' করা হয়। আবার চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬১) 'যে' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গীত বিতানের তৃতীয় সংস্করণেও 'যে' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আর কত উদাহরণ দেবো? এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, তাদের অপূর্ব্বত্ব, তাদের অনন্যসাধারণ মৌলিকত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীও তাঁদের সুরদলনী লীলার অনুরক্ত সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে

গান রেকর্ড করবার অধিকার গ্রামোফোন কোম্পানী কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করেন, সে অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। বিকৃত সুর ও বিকৃত উচ্চারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহু রেকর্ডে বিভীষিকা জাগিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় স্বরূপ ব্যবহার না করে যদি তাঁর এই মহতী সৃষ্টির সত্য রূপটিকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সকলের কাছে ধরে দেওয়া তাঁদের পরম কর্তব্য বলে মনে করতেন, তাহলে গ্রামোফোন কোম্পানী অকিঞ্চিৎকর অর্থ দিয়ে যে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে তা কবে বন্ধ হয়ে যেত।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বিকৃতির জন্যে আমাদের রেডিও কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নন। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গান তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁদের মর্জি মত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর একটু আধটু বদল করে গান। যেখানে তান আদবেই ছিল না সেখানে তান দিয়ে গান। এটা যে কত বড় অশালীনতা তা বলে শেষ করা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর হাত চালাবার ও নিজের খেয়াল মত রঙ (কাদা!) লেপবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলার যে আসুরিকী লীলা সুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখেছিলেন দিলীপ রায়কে সেটিকে মানার দিক থেকে বেপরোয়া আধুনিকদের বাধা থাকলেও, জানার দিক থেকে আশা করি বাধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তুমি কি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকমভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি।...যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম।...হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন।...কিন্তু আমার গানে আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।'

এই হলো রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে হুড়োহুড়ি চলেছে তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত।

শুধু এই নয় আরও এক ধরণের ব্যভিচার শুরু হয়ে গেছে রাগ-রাগিনীর এলাকাভুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে নিয়ে। এ পর্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু ব্রহ্ম সঙ্গীত। যেহেতু এই গানগুলি রাগ-রাগিনীর সুরলোকের বাসিন্দে, কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ তাই ধরে নিয়েছেন যে রাগের শাস্ত্রসম্মত পুরো বিস্তার করবার অধিকার তাঁদের আছে এই গানগুলিতে, বাহার রাগে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ, 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক। এই গানটি মূলতঃ বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ জায়গায় জায়গায় এমন দু-একটি স্বর যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করে দেখলে শুদ্ধ বাহার রাগে লাগে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো রাগ-রূপ সৃষ্টি করার কাজে লাগেন নি। তিনি

সারা জীবন একটি সাধনাই করে গেছেন, সেটি হচ্ছে গান সৃষ্টির সাধনা। গানের কাব্যাংশের বচনীয় ভাবটিকে অনির্ব্বচনীয় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর সারাজীবনের সাধনা। এখন যদি কোন ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত' গানটি মূলতঃ বাহার রাগে রচিত বলে গানটিতে বাহার রাগে শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহলে তাঁর দুঃসাহসের প্রচুর তারিফ করেও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে কখনো রাগরাগিনীর রূপ ফোটাবার আধার হিসেবে ব্যবহার করেন নি। সুরকে তিনি ব্যবহার করেছেন গানের কথার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাঁর গান একলা সুরের অদ্বৈত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। কথা ও সুরের দ্বৈত প্রকাশের লীলাভূমি তাঁর গান। তাই মূলতঃ বাহার রাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাব প্রকাশের তাগিদে তিনি বাহারের বাঁধা-ধরা স্বর-নক্সার মধ্যে অন্য স্বর অসঙ্কোচে মিশিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব, তাঁর স্বকীয়ত্বের প্রকাশ, তাঁর গান সৃষ্টির অসাধারণত্ব। যে সঙ্গীতজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলিকে তাদের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করবেন রাগরাগিনীর শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলার বাসনায়, তাঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষত্বটুকুকে লোপ করে এক অনন্যসাধারণ গান-স্রষ্টার রচিত অসাধারণ সুরগুলিকে সাধারণ করে তুলবেন। এক কথায় এই সঙ্গীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে শুদ্ধ রাগ-রাগিনীর ভাটপাড়ার বাসিন্দে করে তাদের জাতে তুলবেন বটে কিন্তু তাদের প্রাণে মারবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উদ্দেশ্য ও তাঁর সুর রচনার উদেশ্য তো বারবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—'সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্টি শুনায়—তথাপি অনাবশ্যক ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুর সমষ্টি, ভাব না থাকলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।'

তিনি বলেছেন 'গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উঁচু আসন দিই। তাঁরা সঙ্গীতকে চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁরা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 'যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুণ আমি পঞ্চমকে বহাল রাখিব কেন?'

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনভর সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বহাল রেখেছেন, রাগরাগিনীর কাঠামোর শুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদবেই ব্যস্ত হননি, যেটি বলতে

চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হোলো কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেল কি গেল না একমাত্র এইটেই ছিল তাঁর দেখবার বিষয় ও ভাববার বিষয়, আজ তাই রাগ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিযান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই সব গানগুলির বিকৃতকৃত সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন, আবার এটাও লিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চলবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতকৃত সুরেও চলবে তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটাই বলতে হবে যে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো শুধু বিশ্বভারতীর নয়, সে দায়িত্ব দেশবাসীর।

সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে গেলে সঙ্গীত ও সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণাগুলি আমাদের জানা একান্ত দরকার। এখন তাই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর বিশেষ ধারণাগুলি ধরে দেবার চেষ্টা করবো।

তাঁর নিজের তৈরি গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলছেন সেগুলি জানা থাকলে তাঁর গানগুলিকে থেঁতলাবার যে প্রক্রিয়া অধুনা একদল লোক চালিয়ে চলেছেন, হয়তো সেটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে শরিফ বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।'

দিলীপ রায়কে তিনি লিখেছেন, 'তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশ যে ভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সঙ্গীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্ব যে কি তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্রিত সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য-রসের আনন্দ এক হয়ে একাত্ম হয়ে মিলিত।'

এবারে তাঁরা গানগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবার যে খুসমেজাজী স্বাধীনতা অনেকে নিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— আমার গানের বিকৃতি প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।...ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার রস নির্ভর করে। গানের খেলাতে তাকে রসিক হোক, অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলটপালট করতে সহজে পারে বলে তার

উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।

আশা করা যাক যে, তাঁর বেদনা-সিঞ্চিত এই কথাগুলি জানার পরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নিয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিকৃত করবার অপকর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত হবো।

সঙ্গীতের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু এই তাল নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি, গানের প্রাণকে তালের পদাঘাতে হত্যা করবার যে বীভৎস কাণ্ড ওস্তাদী গানের আসরে প্রায়ই চোখে পড়ে, সে যে সূক্ষ্মতম রসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দেবে এটা সহজেই ধারণা করা যায়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'তাল জিনিষটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী। সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি হতে থাকে।...সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে।'

নিছক কৌশল জানা ওস্তাদদের হাতে পড়ে গান যে সুর ও তালের কসরৎ দেখানোর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেন না রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুর-তালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেন না কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।'

তিনি বলেছেন—'রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়। ... এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল, তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিলত, গান গাওয়া যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখনই গানের খ্যাতি পেত লড়াইয়ের নয়।'

সব সৃষ্টির মত গানও সংস্কারের শিকল পরে অচল হয়ে থাকতে পারে না। সংস্কারবদ্ধ সৃজনী শক্তিহীন ওস্তাদেরা তাঁদের অভ্যস্ত সংস্কারের বাইরের সব কিছুকে সন্দেহের চোখে, ভয়ের চোখে, এমন কি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। তবুও নূতন সৃষ্টি হবে, মানুষ সংস্কারের পাষাণ সরিয়ে সৃষ্টির ঝরণাকে বারে বারে মুক্তি দেবে। গানের বেলাও সেই একই কথা। সংস্কারের এই অত্যাচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে শিকল তাঁরই বীণার তারে তৈরী হলেও নয়। ... দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকে সে বড়ো বলে জানে, প্রাণকে নয়।'

কিছু লোকের ধারণা যে আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত উৎকর্ষের এমন চূড়ায় পৌঁছে গেছে যার পর আর কোন শিখর তার চড়বার কিম্বা দখল করবার নেই। সৃষ্টিশক্তিতে

দেউলে এই ভীরুদের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেছেন—'মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।'

তাঁর এই সত্যবাণীও স্মরণ রাখার দরকার যে মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টিও করে।'

অমিতাভ চৌধুরীর সারা জীবন তো রবীন্দ্রভাবনাতেই কেটেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি লিখেছেনও প্রচুর। তাঁর মাথাতেও স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের অসংগতি কেন? এই নামেই তিনি একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তার খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি সবটুকুই এখানে পেশ করছি।

রবীন্দ্রসংগীতে সুরের অসংগতি কেন?

অমিতাভ চৌধুরী

...রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপিকারদের যোগ্যতা ও পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত রচনার কালকেও দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) প্রাক্ শান্তিনিকেতন পর্ব এবং (২) শান্তিনিকেতন পর্ব। রবীন্দ্রসংগীত বলতে ইদানীং আমরা যা বুঝি, শান্তিনিকেতনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ অধিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত তা ছিলো না। লোকে তখন 'রবিঠাকুরের গান' বললে বুঝতো রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গান, পরে বুঝতে শিখলো রবীন্দ্রনাথের রচিত গান। আগে রবীন্দ্রনাথের গান ছিলো সাধারণ বাংলা গানেরই একটি অঙ্গ কিংবা ব্রহ্মসংগীতের অংশ। পরে তার মেজাজ গায়কী ঢঙ ইত্যাদি বিশেষ চরিত্রের রূপ নিয়ে 'রবীন্দ্রসংগীত' আখ্যা পেলো এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কিছু ব্রাহ্ম পরিবার, কিছু রবীন্দ্রভক্ত ও কিছু শান্তিনিকেতনীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছলে। এই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি ব্যাপারটাকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করার চেষ্টাও চলতে লাগলো এবং পরিণামে তৈরি হল স্বরলিপি সমিতি। বেরোতে লাগলো খণ্ডে খণ্ডে স্বরবিতান।

প্রাথমিক পর্বে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকার হিসাবে আমরা প্রধানত পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলা দেবী, প্রতিভা দেবী এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের গানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। সুতরাং তিনি যে স্বরলিপি রচনায় হাত দেবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেই সময়েই দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবী এবং ভাগিনেয়ী সরলা দেবী 'রবিকাকা' বা 'রবি-মামা'-র গানের জগতের বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, এঁরা সকলেই সংগীতবিদ। তার মধ্যে ইন্দিরা দেবীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা পরে উল্লেখ করছি। কাঙালীচরণ সেন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বাঁধা গায়ক এবং ছয় খণ্ডে

সমাপ্ত ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপির রচয়িতা। ফলে আদি পর্বে তাঁর হাত দিয়েও রবীন্দ্রনাথের বহু গান স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের সংগীতাচার্য।

বাংলা স্বরলিপির উদ্ভাবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও একটি পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু টিকে রইলো দ্বিজেন্দ্র-রীতিই। এই রীতিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটু পরিমার্জিত ক'রে নাম দেন 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি।' তাঁর সংকলিত স্বরলিপি গীতিমালা গ্রন্থ এই রীতিতেই প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' 'বালক' 'ভারতী' 'সাধনা' 'বীণাবাদিনী' 'আলাপিনী' 'আনন্দ সংগীত পত্রিকা' 'শান্তিনিকেতন' 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। স্বরবিতান খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আগে সাময়িক পত্রাদি ছাড়া আদি পর্বে অন্য যে-সব বইয়ে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ছিলো, তার মধ্যে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা (১৩০৪ সাল) সরলাদেবীর শতগান (১৩০৭) কাঙালীচরণ সেনের ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি (১৩১১-১৩১৮), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতলিপি (১৩০৩-১৩১১)। মধ্যপর্বে ছাপা হয় গীতলেখা, গীতপঞ্চাশিকা, বৈতালিক, কেতকী, শেফালি, কাব্যগীতি, গীতবীথিকা, নবগীতিকা। স্বরলিপিকার প্রধানত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দিনেন্দ্রনাথ না থাকলে শত শত রবীন্দ্রসংগীতের সুর চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতো। সব মিলিয়ে মুখ্য স্বরলিপিকার তিনিই। শেষপর্বে স্বরবিতান। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে বেরোয় পাঁচ খণ্ড, মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত আরও বেরিয়ে ৫৬টি খণ্ড। অর্থাৎ মোট ৬১টি। আরও দু-চারটি খণ্ড বের করার কাজ চলছে। স্বরবিতানের এইসব খণ্ডে পূর্ব-প্রকাশিত স্বরলিপি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও সুর দেওয়া গান হাজার দুয়েক। তার মধ্যে হাজার দেড়েক গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছে। বেশ কিছু গানের সুর কারও জানা নেই, সুতরাং স্বরলিপি আকারে প্রকাশের কোনো সম্ভাবনাও নেই।

পঞ্চ স্বরলিপিকার

এবারে আসি স্বরলিপি সমিতির কথায়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের গানের সুর সংরক্ষণের প্রশ্ন আসে। এতো গান, এতো সুর, এগুলো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে না রাখলে পরে সব তালগোল পাকিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটবে। তাই উদ্যোগী হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এবং ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় বিশ্বভারতী স্বরলিপি-সমিতি। সভানেত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এবং সম্পাদক অনাদিকুমার দস্তিদার। তাছাড়া সমিতির সদস্য হিসাবে রইলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ। সভানেত্রী ইন্দিরা দেবী কাগজে-কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালেন, সমিতির চারজন সদস্য—সভানেত্রী স্বয়ং, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ সুর সম্পর্কে যা বলবেন, সেটা প্রামানিক বলে গৃহীত হবে এবং পূর্ববর্তী স্বরলিপিকার—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখদের রচিত স্বরলিপিও গ্রাহ্য হবে।

স্বরলিপি সমিতি যুক্ত হলো বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সঙ্গে এবং তার সদর দপ্তর হলো কলকাতায়।

দিনেন্দ্র-ইন্দিরা-অনাদি-শৈলজা-শান্তিদেব—এই প্রধান পাঁচজন স্বরলিপিকারকে প্রামাণিক বলে গণ্য করার কারণ, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টির সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিত কালেই এই পাঁচজনকে তাঁর গানের সুরের অথরিটি বলে স্বীকার করে নেন। এই স্বীকৃতির প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় ও চিঠিতে। শান্তিনিকেতন পর্বে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী। রবীন্দ্রনাথ গানে সুর দেওয়ামাত্র দিনেন্দ্রনাথকে শিখিয়ে দিতেন এবং দিনেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তা হয় নিজে স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখতেন, নয় অন্তরঙ্গ কোনো ছাত্রকে শিখিয়ে স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখতে বলতেন। ১৯৩৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়েন এবং ১৯৩৪ সালে কলকাতায় মারা যান। জীবনের সেই শেষ এক বছর তিনি যে-সব গানের সুর জানেন, অথচ স্বরলিপি করেননি, সেগুলো ঝড়ের বেগে করে দেন। অনেকগুলোর প্রুফ পর্যন্ত দেখে যেতে পারেননি, মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নেয়।

শান্তিনিকেতন-পর্বে শেষদিকের গানের প্রধান সঙ্গী যেমন দিনেন্দ্রনাথ, প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্বে তেমনি ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। বাল্যে বা কৈশোরে সংগীতসঙ্গী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তারপর দীর্ঘদিন একটানা ইন্দিরা দেবী। তাছাড়া তিনি ১৮৮১ থেকে ১৯৪১—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বছর ব্যাপী সংগীতসৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। অবশ্য তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানে তাঁর কথা এবং শেষ দিকের গানে দিনেন্দ্রনাথের কথা চূড়ান্ত।

ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথের পরেই আসেন অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ। অনাদি দস্তিদার ১৯১২ থেকে ১৯২৫—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র। বহু গান তিনি এই দুজনের কাছে সরাসরি শিখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে স্বরলিপি রচনা বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম বৃত্তিপ্রাপ্ত সংগীত-ছাত্র। ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতন ছাড়ার পরও তিনি রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যুক্ত থাকেন এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গানের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী—এই তিন জনেরই তিনি ছিলেন আস্থাভাজন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতন যান এবং প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেন এবং অল্প কিছুদিন শেখেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে। বহু গানের সুরের সরাসরি অধিকার তিনি পান এবং দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতন-সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ হিশাবে কাজ করেন। শান্তিদেব ঘোষ শৈশব থেকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্নেহে মানুষ এবং রবীন্দ্রনাথ ও

দিনেন্দ্রনাথ—দুজনের কাছেই গান শিখেছেন। বহু গানের সুর তাঁর কণ্ঠে বা খাতায় আবদ্ধ ছিলো। তাছাড়া অনাদিকুমার বা শৈলজারঞ্জনের চেয়ে একটি ক্ষেত্রে তাঁর জিত। গায়ক হিশাবে তিনি খ্যাতিমান। রবীন্দ্রনাথের ও দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি এখনও তাঁর কণ্ঠে পাওয়া যায়। তিনি সংগীতভবনের অধ্যক্ষতা করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।

অর্থাৎ উপরের এই পাঁচজনকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান ভাণ্ডারী বলা চলে। স্বরলিপি-সমিতি গঠনের আগে দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটায় তিনি সমিতিতে থাকতে পারেননি। সঙ্গত কারণেই থাকেন বাকি চারজন। ঐ পাঁচজন এবং আদিযুগের কয়েকজনকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপিকারদের একটি পূর্ণ তালিকা এই সঙ্গে দিলাম। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর একটি মাত্র গানের স্বরলিপি করেছেন—'এ কি সত্য, সকলি সত্য।' নামের তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলা দেবী, প্রতিভা দেবী, ভীমরাও শাস্ত্রী, সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, আরনল্ড বাকে, সমরেশ চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার দাস, মোহিনী সেনগুপ্তা, রমা কর, সাহানা দেবী, সুধীরচন্দ্র কর, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, বামন শিরোদকার। শেষোক্ত সকলেই রবীন্দ্রসংগীতের জগতে ঘনিষ্ঠ এবং মুখ্য স্বরলিপিকাররা ছাড়া অন্যরা অল্প যে কয়েকটি গানের স্বরলিপি করেছেন, তার সবগুলিই সমিতির সদস্যদের অনুমোদিত।

এখন প্রশ্ন, স্বরলিপির মধ্যে সুরান্তর কেন? এক সংস্করণের স্বরবিতানের সঙ্গে অন্য সংস্করণের তারতম্যই বা কেন? গোড়াতেই বলে রাখি এই সুরান্তর বা তারতম্য যৎকিঞ্চিৎ এবং তা খোদার উপর খোদকারিও নয়। তাছাড়া সুরের সামান্য তারতম্যের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

কারণও আছে। মনে করুন ১৮৯১ সালে তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে কাউকে সদ্যোরচিত একটি গান তিনি শেখালেন, সেই শিক্ষার্থী স্বরলিপি করে রাখলেন। আবার সেই একই গান ১৯২১ সালে তাঁর ষাট বছর বয়সে অন্য-একজনকে তিনি শেখালেন। সেই মতো পরবর্তী জনও আর-একটি স্বরলিপি করে রাখলেন। কিন্তু দুটো স্বরলিপি মেলাতে গিয়ে দেখা গেলো জায়গায় জায়গায় সুরের তফাৎ। রবীন্দ্রনাথের গলায় তফাৎ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং গায়কও তিনি। মাঝখানে ব্যবধান তিরিশ বছরের। গাইতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে বা বিস্মৃতির কারণে একটু-আধটু সুরান্তর হতেই পারে। তাছাড়া গলা যন্ত্র নয়, ষোলো আনা পুনরাবৃত্তি সম্ভব না হতেও পারে। তবে কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সুরান্তর সামান্যই।

দুই নম্বর কারণ, বহু গানের সুর রবীন্দ্রনাথ পরে নিজেই কিছু-কিছু পালটে দিয়েছেন। এই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে নানা কারণে। যেমন ধরুন 'বাল্মীকি প্রতিভা'। প্রথম অভিনয়ের ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর এই নাটক শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছে অজস্রবার।

পরবর্তী অভিনয়ের মহড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহু গানের গাওয়ার ধরন ও কিছু কিছু সুর পালটে দিয়েছেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ভাবেই স্বরলিপি করেছেন। দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে পাকাপাকি থাকতে এসে ইন্দিরা দেবী যখন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র গান শুনলেন, তিনি তো অবাক। কেননা ১৮৮১ সালে প্রথম অভিনয়ে তিনি ছিলেন অন্যতম অভিনেত্রী এবং সব গান তাঁর জানা। তিনি তাঁর জানা মতো সুরের স্বরলিপি করলেন। এখন প্রশ্ন, কোন্‌টা ঠিক? ঠিক দুটোই। দুটোই রবীন্দ্রনাথের সুর এবং সেই কারণেই বিশ্বভারতী স্বরবিতানে ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথের করা দুটো স্বরলিপিই রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেও এই রকম নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যেমন 'বিশ্ববীণা রবে' গানটি রচনার আদিকালেই এই গানের সুরের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী পরিচিত। কিন্তু অনেক পরে শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের কাছে যাঁরা এ গান শিখেছেন, তাঁরা গাইতেন একটু অন্যভাবে। সুরান্তর শুনে ইন্দিরা দেবী দরবার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, বলেছিলেন, দিনেন্দ্রনাথ যা শেখাচ্ছেন, তা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন বিপদে। একদিকে ভাইঝি, অন্যদিকে নাতি। শেষমেষ তিনি রায় দিলেন, পরে যা পরিবর্তন হয়েছে এবং দিনেন্দ্রনাথ যেভাবে যেভাবে শিখিয়েছেন, তা তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়েছে এবং এই পরিবর্তন খারাপ হয়নি।

এই ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক। তাছাড়া গাওয়ার সময়ও কিছু অদলবদল হতে পারে। যেমন 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি। আদি স্বরলিপিতে 'তব শুভ নামে' অংশটি কখনও গাওয়া হতো সা-রে-গা, কখনো গা-গা-গা। স্বরলিপিতে পরেরটাই আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় গানটি উচ্ছন্নে গেল। এবং স্বরলিপিতে আছে বলে পরেরটাই গাওয়া উচিত। তাছাড়া স্বয়ং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও যেমন কিছু ভুল করতে পারেন, অন্যের পক্ষেও তা সম্ভব। কেননা দীর্ঘদিন ধরে মুখে মুখে শ্রুতির আকারে বহু গান চলেছে। নিজে ভুলে যেতেন বলে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষকেই নির্ভর করতেন বেশি। বিশেষ করে দিনেন্দ্রনাথের উপর এত বেশি নির্ভর ছিলেন যে, নিজের ভুলচুক স্বীকার করে আসল সুরের জন্যে দিনেন্দ্রনাথের উপর তিনি বরাত দিতেন। ওয়ার্ধায় অনশনভঙ্গের সময় গান্ধীজি যখন তাঁর প্রিয় পূজার গান 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গাইতে অনুরোধ করেন, রবীন্দ্রনাথ বলেন, সুরটা তাঁর পুরো মনে নেই। গান্ধীজি পীড়াপীড়ি করলে গানটি তিনি গেয়ে শোনান এবং পরে হাসতে হাসতে বলেন, 'ভাগ্যিস দিনু কাছাকাছি নেই, নইলে সুরে অনেক ভুল ধরতো।'

আবার দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি পালটে দেওয়া হয়েছে বলে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁরাও অনেক সময় না জেনেশুনে করেন। প্রথম যুগে স্বরলিপি রচনায় যেমন কিছু ত্রুটি থাকতো, তেমনি ভালো প্রুফ না দেখার জন্যেও কিছু কিছু ভুল ছাপা হয়ে গিয়েছে আদি স্বরলিপিতে। যেমন স্বরবিতান দ্বিতীয় খণ্ড। প্রধান স্বরলিপিকার

দিনেন্দ্রনাথ। ৩৯টি গান তাঁর, ১০টি অনাদি দস্তিদারের। প্রথম সংস্করণে যা ছাপা হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ নিজেই তা সংশোধন করে ছাপিয়েছেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হয়ে যাওয়ার অনেক গানের প্রথম প্রুফ দেখাও তাঁর সম্ভব হয়নি। স্বরবিতান চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ডে আছে পূর্বপ্রকাশিত 'নব গীতিকা' বইয়ের স্বরলিপি, পরবর্তী সংস্করণে যখন একটু-আধটু পরিবর্তন করা হলো, তখন দেখা গেলো বদনশশী দে বা গোবর্ধন পাল নামের দু'চার জন লোক চেঁচামেচি শুরু করলেন, দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি নাকি পালটে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা জানেন না, 'নবগীতিকা'-র সম্পাদকের খাতায় দিনেন্দ্রনাথ নিজের হাতে 'নবগীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত বহু গানের স্বরলিপির সংশোধন করে দিয়েছিলেন এবং সেই সংশোধনের জোরেই স্বরবিতান চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ডের পরিবর্তিত সংস্করণ। স্বরবিতানের প্রথম সংস্করণে 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়' গানটি যে তালে দিনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করেছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি নিজেই তাল পালটে নতুন স্বরলিপি করেছেন এবং পরেরটাই এখন গাওয়া হয়। অভিযোগকারীদের দাবি অনুযায়ী অবশ্য আদি ভুলকেই সঠিক বলে মেনে নেওযার কথা।

আসলে মুশকিল দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের অথরিটির সংখ্যা হুড়হুড় করে বেড়ে যাওয়াতে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এখানে সেখানে অনেকেই বলতে লাগলেন, অমুক গানটা এই রকম আমি কবিগুরুর কাছে শিখেছি, তমুক গানটা দিনদা আমাকে এইভাবে শিখিয়েছেন ইত্যাদি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই দাবির বেশির ভাগই বাজে বা অর্ধসত্য। সেকালে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার লোক ছিলেন অল্প। গলায় সামান্য সুর থাকলেই কোরাসের দলে ওঁরা বসে যেতেন সতরনজির শেষ প্রান্তে। রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথ শেখালেও তাঁদের গলায় হয়ত সে গানের সুর ঠিক মতো ধরা পড়তো না। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেই একই গানের স্বরলিপি ছাপা হলে এঁরাই তখন বলতে লাগলেন, 'আমরা কিন্তু অন্য রকম শিখেছিলাম।' ভুল শেখা এই সব লোকের কথা চ্যালেঞ্জ করার জন্যে তখন রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথ বেঁচে নেই। এক্ষেত্রে স্বরলিপি সমিতির কর্তব্য কী? কর্তব্য খাঁটি লোককে বের করা। স্বরলিপি সমিতি তাই করেছেন।

তাহলে কি স্বরবিতানে কোন ভুলচুক থাকছে না? হয়ত থাকছে, এবং থাকছে বলেই পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা পূর্ববর্তী সংস্করণকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে চান, তাঁরা ভালো করে তলিয়ে দেখলে দেখতে পারেন, পূর্ববর্তী সংস্করণে এমন ছাপার ভুল বা অন্য ভুল আছে, যার সাহায্যে গানটি গাওয়া যায় না। কাঙালীচরণ সেন বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি পালটে দেওয়ার অভিযোগও কল্পিত। একই গানে দু'রকম বা তিন রকম স্বরলিপি থাকলে স্বরবিতানে সুরান্তর হিশাবে সব কটিই তুলে দেওয়া হচ্ছে। গীতাঞ্জলির অনেক গান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কাঙালীচরণ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভীমরাও শাস্ত্রী—এই চারজন স্বরলিপি করেছেন। এই স্বরলিপিতে হুবহু মিল যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু কিছু পার্থক্য। এই পার্থক্য কেন, তার কারণ আগেই বলেছি।

স্বরবিতানের স্বরলিপিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) নূতন প্রকাশিত স্বরলিপি (২) পুনর্মুদ্রিত ও অপরিবর্তিত স্বরলিপি এবং (৩) পুনর্মুদ্রিত ও সম্পাদনায় যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত স্বরলিপি। যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত স্বরলিপির সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটির বেশি নয় এবং এগুলি পরিবর্তিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে। তবে এই পরিবর্তনে কখনই সুরের কাঠামো পালটায়নি বা অরাবীন্দ্রিক কোন কিছুর অনুপ্রবেশ তাতে ঘটেনি। স্বরলিপিকারের পূর্ববর্তী ত্রুটি বা কবিকৃত পরবর্তী সংশোধনের ভিত্তিতে স্বরলিপির কিঞ্চিৎ সংশোধন অপরাধ নয়।

সংগীত পর্ষদ

বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির মতো আর একটি শাখা আছে, যার নাম বিশ্বভারতী সংগীত পর্ষদ বা মিউজিক বোর্ড। রবীন্দ্রসংগীতের প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রকাশের দায়িত্ব যেমন স্বরলিপি সমিতির, রবীন্দ্রসংগীতের সুর প্রামাণ্য হলো কিনা পরীক্ষা করার দায়িত্ব মিউজিক বোর্ডের। গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বোর্ডের কারবার। কোন কোন স্বরলিপি আর রেকর্ডের সুরের ক্ষেত্রে তফাৎ থেকেছে। থাকার কারণ পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাব। আবার অনেক সময় রেকর্ডের সুর ও স্বরলিপির সুর দুটোই প্রামাণ্য। রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমানে যাঁরা প্রধান প্রধান গায়ক, তাঁরা হয়ত রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, অনাদি দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ বা শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে সোজাসুজি গান শিখেছেন এবং সেই ভাবেই রেকর্ড করেছেন। স্বরলিপি যখন পরে বেরোলো, তখন দেখা গেল সুরে বা তালে কিছু তফাৎ। সাহানা দেবীর মুখে গাওয়া 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গানে তফাৎ আছে। আবার কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রেকর্ড আর স্বরবিতানের 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' স্বরলিপিতে কিছু তফাৎ, যদিও স্বরলিপিকার ও রেকর্ডের ট্রেনার একই জন। ট্রেনারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হয়ত বলবেন স্বরলিপিটি পরে এবং সেটাই গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের ক্ষেত্রেও তো তাই হয়েছে। সর্বশেষ সংস্করণই গ্রাহ্য। এই ধরনের তারতম্য অনেক গানে রয়েছে, তবে যথার্থ বলে ধরে নিতে হবে স্বরলিপিকেই।

অবশ্য এক্ষেত্রেও বিপদ আছে, স্বরলিপির অনেক বাঁধাবাঁধি আছে, গলার সব কিছু তাতে ধরা পড়ে না। ফলে বিশিষ্ট কোন গায়কের প্রামাণ্য কোন রেকর্ড থাকলে স্বরলিপিতে সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেমন শান্তিদেব ঘোষের কৃষ্ণকলি। গানটি তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছেন। অথচ স্বরলিপিতে রয়েছে তার কিঞ্চিৎ

পরিবর্তন। এক্ষেত্রে স্বরলিপিটি শান্তিদেব ঘোষকে দিয়ে করানোই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা হয়নি।

এইসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে অধিকারভেদ আছে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে। জনপ্রিয় গায়ক, তাই আমরা খুশিমত সুর পালটাবো বা স্বরলিপি বহির্ভূত গানে আপন মনের মাধুরী মেশাবো, এই অনাচার চলে না। রবীন্দ্রনাথের লেখা গান রবীন্দ্রনাথের সুরেই গাইতে হবে। যদি পরিবর্তন থাকে, তাহলে প্রকাশ্যে দেখাতে হবে কোথায় কীভাবে কখন এই পরিবর্তিত রূপ তিনি সংগ্রহ করেছেন। কেউ যদি কোন গান স্বরলিপি নির্দেশিত কাহারবা তালের পরিবর্তে দাদরা তালে গেয়ে রেকর্ড করে থাকেন তাহলে তাঁকেও এই পরিবর্তনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী খেমটার চালে কোন গানের অংশ রেকর্ডে গেয়ে থাকেন তাহলে তাঁরও জানানো দরকার এই অংশটি তিনি কীভাবে কার কাছে থেকে শিখেছেন। এই ব্যাপারে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরুমুখী বিদ্যার অধিকারী বা অধিকারিনীদের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি।

আদত কথা, বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতি গঠন করে খণ্ডে খণ্ডে স্বরবিতান প্রকাশ করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রসংগীত বাঁচলো। আজ থেকে পঞ্চাশ একশ বছর পরে গুরুমুখী বিদ্যাধর যা বিদ্যাধরী যখন কেউ থাকবেন না তখন একমাত্র অবলম্বন হবে স্বরবিতান। নজরুল ইসলাম বা ডি. এল. রায়ের গান নিয়ে যে নৈরাজ্য, স্বরলিপি সমিতি না থাকলে রবীন্দ্রসংগীতের একই দুর্দশা হতো। স্বরবিতান যদি বিলুপ্ত না হয়, তাহলে পাঁচশো বা হাজার বছর পরেও ভবিষ্যতের গায়করা রবীন্দ্রনাথের সুরে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারবেন। গ্রামোফোন রেকর্ড টিকে থাকলেও তা নাকচ হয়ে যবে। মানদাসুন্দরী দাসী, দেবব্রত বিশ্বাস, কনক দাশ, অমলা দাশ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, রাজেশ্বরী দত্ত, কে. মল্লিক—এই আটজন হয়ত স্বরলিপি সমিতি গঠনের আগে একই গান বিভিন্ন সময়ে আট ভাবে রেকর্ড করেছেন। এই আট খানা রেকর্ড শুনে ভবিষ্যতের গায়ক গায়িকারা বিভ্রান্ত হয়ে আশ্রয় নেবেন স্বরবিতানের। আজ যেটা সচল, পরবর্তী যুগে দু'একটি বাদে তাই হবে অচল। গ্রামোফোন কোম্পানি যে প্রামাণ্য নয়, তা বিচার করা যায় 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির প্রচার দেখে। গানটির কথা রবীন্দ্রনাথের, সুর পঙ্কজকুমার মল্লিকের। অথচ ওঁরা এটিকে রবীন্দ্রসংগীত বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীর কাছে গ্রামোফোন কোম্পানির এই প্রচার বিরক্তির কারণই ঘটিয়েছে।

এবারে উপসংহার টানি। রবীন্দ্রসংগীতকে রাবীন্দ্রিক হতে হবে, এই যুক্তি সর্বপ্রথম গ্রহণ করে স্বীকার করা ভাল, স্বরলিপি সমিতি যা যা প্রকাশ করেছেন, তা প্রামাণ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনের পিছনে যুক্তি ও প্রমাণ দুইই আছে। এই পরিবর্তন কারও স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে নয়। আর কীইবা স্বার্থ থাকতে পারে এই ব্যাপারে। বরং ওই স্বরলিপিকারদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের

স্নেহ ভালোবাসা ও আস্থার বিনিময়ে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান ও রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি রচনায় সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন। যেটুকু মতভেদ, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এবং স্বরলিপি সমিতি গঠনের সময় দিনেন্দ্রনাথ যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে কোন সমস্যাই থাকতো না। ইন্দিরা দেবী দিনেন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পালটে দিয়েছেন, এই অভিযোগ উঠত না, বরং ওঁরা দু'জনে মিলে কাজটা ত্বরান্বিত করে দিতেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী সংযুক্ত না থাকলে রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুর চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতো এবং অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ আস্থা নিয়ে স্বরলিপি রচনায় নিযুক্ত না হলে এতো গান ছড়িয়ে পড়ত না। এই আস্থা অন্য স্বরলিপিকার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গান শেখা মাত্র তৎক্ষণাৎ এঁরা স্বরলিপি করে রাখতেন। স্বরলিপি সমিতি গঠিত হওয়ার আগে এই পাঁচ শিক্ষকই শত শত ছাত্র ছাত্রী তৈরি করেছেন।

আর স্বরবিতান থাকতেই যখন নানা অভিযোগ, গায়কে গায়কে মতান্তর, স্বরবিতান না থাকলে বেদানা দাসী বা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ডে গাওয়া গানই আমরা রবীন্দ্রসংগীত বলে ধরে নিতাম। 'আমার মাথা নত করে দাও হে'র সঙ্গে 'দয়ালু-হে' ঢুকিয়ে গাইতাম এবং মনে করতাম 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া লম্বা লম্বা তান রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। উপরন্তু দেখা যেত, রবীন্দ্রসংগীতের সুর কোনটা আগমার্কা, কোনটা ভেজাল তাই নিয়ে গায়কে গায়কে লাঠালাঠি চলেছে এবং দু'চারজনকে প্রায়ই পাঠাতে হচ্ছে ব্যানডেজ বাঁধা অবস্থায় হাসপাতালে। প্রামাণ্য স্বরলিপি আছে বলেই তা হচ্ছে না। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ ও চরিত্র রক্ষার জন্য থেকে গেছে স্বরবিতান।

সুর ভুলে কি খুঁজে বেড়াই?

হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি আর টিউশনি করে অভাব মেটানো, শুধু এমন জীবন যাপনের জন্যে দেবব্রত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেননি। সঙ্গীতের ফল্গুধারা তখন তাঁর সমস্ত শরীর আর মন জুড়ে বইছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক ও সহপাঠী সন্তোষ সেনগুপ্তের কথায়, 'দেবব্রত বিশ্বাসের সেসময়কার কণ্ঠ বড় আশ্চর্য্য সম্পদ ছিল। আগেকার দিনের মহবলীপুরমের সমুদ্রের মতো উত্তাল উদ্দাম। একই কণ্ঠে এতো মাধুর্য, এত ঔদার্যের ও গভীরতার যেন এক অভাবনীয় সমাবেশ। সে কণ্ঠ কোনো রেডিও-রেকর্ডের মাইক্রোফোনে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সবটাই যেন উপচে পড়ত।'

হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির মেসবাড়ি থেকে দেবব্রতকে সন্তোষ সেনগুপ্ত কিছুদিন তাঁর রসা রোডের বাড়িতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তখন সকাল সন্ধ্যায় শুধু গান আর গান। সবরকমের গানই হত।

বেশিদিন যেন এক জায়গায় থিতু হতে চান না তিনি। কিশোরগঞ্জের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। বাড়ির একমাত্র ছেলে। দিদি সান্ত্বনার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দুদিন পরই বাবা দেবেন্দ্রকিশোর মারা যান। দিদির শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তখন যে নির্মম আচরণ করেছিল, দেবব্রত কখনও ভুলতে পারেননি। হয়তো বা সেই শোক আর অপমানেই দিদি বিয়ের অল্পকিছুদিন পর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিশোরগঞ্জে মা আর ছোটোবোন ললিতা একা। ১৯৩৮ সালে দিদির বিয়ে হয়েছিল। দিদি চিরকালের মতো চলে যাওয়ার পর দেবব্রত মা আর বোনকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বালিগঞ্জে কবীর রোডে মাসিক পঁচিশ টাকা ভাড়ায় একটি দুই কামরার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। মাইনে পেতেন পঞ্চাশ টাকা। অর্ধেকটাই তার বাড়িভাড়া দিতে চলে যেত। টিউশনি না করে উপায় কি ছিল? বোন ললিতাকে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গীত জীবনের দিকে তাকাই, একটা ঘটনার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। একদিন সন্তোষ সেনগুপ্ত বন্ধু দেবব্রতকে সেনোলা রেকর্ড কোম্পানিতে নিয়ে যান। সেখানে তখন রয়েছেন নজরুল ইসলাম। আর নজরুলের সহকারী চিত্ত রায়। নজরুলের সঙ্গে সন্তোষ সেনগুপ্তের

আগেই পরিচয় ছিল। তিনি দেবব্রতকে দেখিয়ে নজরুলের কাছে তাঁর গলা ও গায়নভঙ্গির খুব প্রশংসা করেন। নজরুল দেবব্রতর গান শুনতে চাইলেন। গাইলেন দেবব্রত। শোনা যায়, নজরুল তাঁর গান শুনে খুশি হয়ে নাকি বলেছিলেন 'মন্দ্রসপ্তকে তোমার গলার চলন চমৎকার। ভাবের গানে তুমি মাস্টার হবে।'

দু-খানা গান রেকর্ড হল। একটি ছিল 'মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধো বাদ'। আরেকটি গানের খবর পাইনি আমরা। দেবব্রত নিজেই লিখেছেন, 'আরেকটি গানের কথা আমি ভুলে গিয়েছি।' পড়ে থাকল সেই রেকর্ড। কোনোদিন বেরোল না। ভালো হল কী মন্দ হল জানি না। শুধু একটা অসাড় ভয় জাগে মনে, বেরোত যদি সেই রেকর্ড, জনপ্রিয়তা পেত নিঃসন্দেহে। তখন রবীন্দ্র সুরসাধক দেবব্রতকে আমরা কি এখনকার মতো করেই পেতাম? নজরুল যে ভিন্ন রূপে আমাদের কাছে ধরা দিতেন, সে পাওনা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়তি হত।

ছাত্র হিসাবে নয়, ব্রাহ্মসমাজের সীমিত পরিচয়ের পরিসরে দেবব্রত শুরু থেকেই সঙ্গীত জগতের অনেক বড়ো মানুষের পরিচিতি অর্জন করেছেন। সে তালিকা ঈর্ষণীয়। তারাপদ চক্রবর্তী, কুন্দনলাল সায়গল, অনাদিকুমার দস্তিদার। এইচ এম ভি কোম্পানির হেমচন্দ্র সোম মশাইয়ের সঙ্গে সেসময়ই আলাপ হয়। প্রথম আলাপ করতে তাঁকে রেকর্ড কোম্পানির কাউন্টারে যেতে হয়নি।

ততোদিনে দেবব্রত আকাশবাণীতে গাইবার সুযোগ লাভ করেছেন। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গীত বিশারদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯৪-১৯৬৫)। সুরেশবাবু পেশায় আইনজীবী ছিলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম সাধনা। দেশ বিভাগের পর তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত-প্রযোজক হয়েছিলেন। দেবব্রতকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন যখন, তখন আকাশবাণীর অধিকর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্র মজুমদার। আকাশবাণীর সঙ্গে দেবব্রতর সম্পর্ক ভালোই ছিল। বিমান ঘোষ লিখেছেন, 'কলকাতায়, দিল্লীতে, লক্ষ্ণৌ-এ আকাশবাণীর ভিতরে ও বাইরে কতদিনের কত ঘটনা, টুকরো টুকরো কথা ভীড় করে আসে মনের মাঝে ওর কথা ভাবলেই'। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকাশবাণী লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে গান গাইবার কথা। হঠাৎ তাঁর গলা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে দেবব্রত বিশ্বাস অনুষ্ঠান করে সকলকেই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। কণিকা সুর মেনে নিচু স্বরে গেয়েছেন। দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত গলায় গেয়েছেন। শ্রোতারা দুজনকেই সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হচ্ছে কলকাতায়। ১৯৩০-৩১ সাল। পাইকপাড়ার সিংহি পরিবারে অনুষ্ঠান। অনাদিকুমার দেবব্রতকে সেই অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। বালিগঞ্জে ত্রিকোণ পার্কের পাশে দেবব্রতর এক আত্মীয় (টুটুমামা) থাকতেন। সে বাড়িতে 'অনাদিদার সঙ্গে...পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।'

আমরা এখানে অনাদিকুমার দস্তিদারের কথা খানিকটা বলব। রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভুবনে তিনি আমৃত্যু জীবনযাপন করেছেন। দেবব্রতর গায়নরীতি ও সঙ্গীত পরিবেশনাকে সকল সময় সম্মতি জানিয়েছেন। তবু ঘটনা এই, দেবব্রতকে একসময় 'ভুগতে' হয়েছে।

বাংলার সাধারণ সমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগত কেমন ছিল, খুব সুন্দর বলেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। তেমন কথার প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রগানের একনিষ্ঠ শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের (১৯০০-১৯৯২) কাছেও পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছেন শৈলজারঞ্জন। সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। 'সুরঙ্গমা'য় গান শেখাতেন। গানের স্বরলিপি রচনায় তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। প্রায় দেড়শো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি করেছেন। শৈলদারঞ্জন লিখেছেন :

> 'রবিবাবুর গান তখনো আসরের এক কোণায় একটি সামান্য আসন পেতে বসে। বাংলার আপামর জনসাধারণের চিত্তজয় একদিন তা করতে পারবে, আকাশে বাতাসে রবীন্দ্রসংগীতের সুর ভেসে বেড়াবে—এ তখন অলৌকিক স্বপ্ন। সেদিন বাংলাদেশে সংগীতের আসরে হিন্দি গান ও কলাবতী রাগরাগিণীর প্রশস্ত অধিকার।
>
> বাংলা গান বলতে গজল ঠুংরী রাগপ্রধান গানের বাংলা সংস্করণ মাত্র, বা প্রাচীন ঢঙের কিছু গান—এই লোকে বুঝত। ...প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আর সুরসাধকেরা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তাঁদের শিক্ষার কৌলীন্যকে ক্ষুণ্ন হতে দিতে রাজি ছিলেন না। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এক-আধজন মানুষের যাঁরা তাঁদের জীবনের ব্রতরূপে এই সংগীতের অনুশীলন ও শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করবেন। অনাদিকুমার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'

অনাদিকুমার দস্তিদার ১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীহট্ট জেলার দাসপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা অক্ষয়কুমার দস্তিদার পুলিশের উঁচুপদে কাজ করতেন। তিনি ১৯১২ সালে তাঁর দুই ছেলে অনাদিকুমার ও অবনীকুমারকে বোলপুরের আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন।

১৯২০ সালে অনাদিকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তাঁর গানের শিক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীতে সঙ্গীতের প্রথম ছাত্র। সব মিলিয়ে তিনি প্রায় পাঁচবছর গান শিখেছেন। উঁচুজাতের অভিনেতাও ছিলেন অনাদিকুমার। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে অনেকবার 'বাল্মীকি'-র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

১৯২৫ সালের জুলাই মাসে অনাদিকুমার কলকাতা এসে সিটি কলেজে আই.এসসি. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে আই. এসসি. পাশ করেন। সে সময় সিটি কলেজে কী যেন গোলমাল দেখা দেয়। তখন অনাদিকুমার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন ও ১৯২৯ সালে এই কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। জীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে হয়তো বি.এ. এম.এ. এসব ডিগ্রির কথা বলতে হয়। বড়োমাপের মানুষেরা এমন অবদান রেখে যান, এসব ডিগ্রির আলোচনা আড়ালে চলে যায়। অনাদিকুমারের কথা আমরা এখানে বলতে চাইছি কেন না 'কনক দাস (বিশ্বাস), দেবব্রত বিশ্বাস, জগন্ময় মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কানন দেবী, কুন্দনলাল সায়গল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জয়া দাস, সতী দেবী, শুভ গুহঠাকুরতা প্রমুখ নামী শিল্পীদের তিনিই রবীন্দ্রনাথের গান শেখান।' সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা ও স্ত্রী বিজয়া দুজনেই অনাদিকুমারের কাছে গান শিখেছেন। একাধিক চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অনাদিকুমার। শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা' নাটকের সঙ্গীত পরিচালক অনাদিকুমার। গোড়ায় অনাদিকুমার উদয়শঙ্করের দলে বীণা বাজাতেন।

অনাদিকুমার ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ বছরে 'গীতবিতান'-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কনক দাস ও নীহারবিন্দু সেন—এই দুজনকেই তিনি 'গীতবিতান'-এ নিয়ে এসেছিলেন। ১৯২০ সালের ৩০শে আগস্ট রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে অনাদিকুমারকে লিখেছিলেন :

'তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে একদা সংগীতাচার্য হবে, এই আমার মনে আছে।' বিশ্বভারতীর সঙ্গীতাচার্য হননি অনাদিকুমার, তবে ১৯৪৮ সালে রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর অনুরোধে 'স্বরলিপি সমিতি'-র সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তিনি বড়োরকমের অসুখে পড়েন। কমাস পর সেরে উঠলেও শান্তিনিকেতন-অন্তঃপ্রাণ মানুষটি আর পুরোপুরি শারীরিক ক্ষমতা ফিরে পাননি। ১৯৬১ সালে কবির জন্মশতবর্ষে শান্তিনিকেতনের মহা সম্মেলনে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকি তিনি

শান্তিনিকেতনে থাকতে পারেননি বলে তাঁর একটা দুঃখ ছিল। নিজেই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, দিনেন্দ্রনাথের পরে যেন অনাদিকুমার শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতবিদ্যার ভার গ্রহণ করেন। তবে সাধ্যমত সময় দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের শেষ পরীক্ষায় তিনি নিয়মিত পরীক্ষক হয়ে যেতেন। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ছিলেন 'দিন্‌দা'। দিন্‌দা যখন রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি করছেন, অনাদিকুমার ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনা তিনি কখনও সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাথার্থ্য বিচারের এই মানুষটি চলে যাওয়ার পর, দেবব্রত বিশ্বাস লিখলেন : 'দস্তিদারদা চইলা গেল ভব নদীর পার, আমি আর গাইতে পারলাম না।'

১৯৬৬ সাল থেকে তাঁর চলাফেরার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি অনাদিকুমার আমাদের ছেড়ে চলে যান। ১৯২০ সালের ৫ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ অনাদিকুমারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সংগীতে তোমার নিষ্ঠা আছে বলেই আমি তোমাকে সংগীতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করতে উৎসাহ দিচ্ছি।' যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনাদিকুমারকে সংগীতাচার্য হবার কথা লিখেছিলেন, সেই চিঠিতেই লিখেছেন :

'...দিনুর কাছ থেকে ইংরেজি সংগীতের staff notation ও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সংগীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে।...ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য সংগীতেও তোমাকে প্রবেশ লাভ করতে হবে—তার পরে তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে একদা সংগীতাচার্য হবে এই আমার মনে আছে।' (৩০শে আগস্ট ১৯২০)

যে অনাদিকুমার রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ দুজনের কাছেই সঙ্গীতবেত্তার শংসাপত্র লাভ করেছেন, তাঁর অভিমতের দাম দিতেন দেবব্রত বিশ্বাস, তবু দেবব্রতের পরিবেশনায় এককালে কেউ কেউ নানা দুর্বলতার উৎসমুখ খুঁজে বেরিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্র

'শ্রীমান অনাদিকুমার দস্তিদার দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছাত্রভাবে থাকিয়া গান শিক্ষা করিয়াছেন। আমার রচিত বহুসংখ্যক বাংলা গান ইঁহার জানা আছে। এই গানগুলি যাঁহারা শিখিতে ইচ্ছা করেন ইঁহার সহায়তায় সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।... (২৯ আষাঢ় ১৩৩২)'

'...Sriman Anadikumar Dastidar who was for long a student at

Santiniketan is personally quite well known to me .... He is able to sing accurately a large number of my songs and has devoted some time to the study of Hidusthani music .... I believe he will give satisfaction to all who desire painstaking teacher of music.' (December 18, 1925)

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শংসাপত্র

This is to certify that Sreeman Anadikumar Dastidar was a pupil of mine for a long time and has learnt from me most of Rabindranath's songs which he can render correctly. (June 24, 1925)

দেবব্রতর কথায় যাই। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "তখনকার দিনে 'স্বরবিতান' নামের কোনো স্বরলিপি বই-এর নাম শুনিনি। স্বরলিপি বুঝতাম না।" ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। স্বরলিপি দেখে গান গাওয়া শিখেছেন। স্বরলিপি লিখতেও শিখেছেন। ১৯৫৩ সালে চীন ভ্রমণের সময় এই দুই বিষয়েই তিনি ওস্তাদ।

আগে একজায়গায় বলেছি আমরা, একক গানে দেবব্রত গোড়ার দিকে বিন্দুমাত্র স্বস্তিবোধ করতেন না। এইচ এম ভি-র হেমচন্দ্র সোম মশাই শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় কনক দাস ও দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি দ্বৈত সঙ্গীত রেকর্ড করে প্রকাশ করেন। দুটিই রবীন্দ্রনাথের গান। 'সংকোচের বিহ্বলতা' একটি গান। অন্য গানটি 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'। ১৯৪০ সালে এই রেকর্ডটি বেরোয়। রেকর্ডটির চাহিদা ছিল। কিছুদিন পর দুজনের আরও একটি দ্বৈতসঙ্গীতের রেকর্ড বেরোয়। রবীন্দ্রনাথের-ই গান। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' ও 'ওই ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে'। সঙ্গীত নির্বাচনে এইচ এম ভি-র কর্তাব্যক্তিদের কতোটা ভূমিকা ছিল, শিল্পী দুজনেরই বা কতোটা ভূমিকা ছিল, আজ আর জানতে পারব না। তবে অবাক খানিকটা লাগেই আমাদের, ব্রাহ্মসমাজের নানা উৎসবে যাঁরা সম্মেলক সঙ্গীত গাইতেন, তাঁরা কেন এমন গানের রেকর্ড করেছিলেন? সময়টা পৃথিবীর তখন খুব অস্থির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লাঞ্ছনা ভুগতে হচ্ছে দেশে দেশে সাধারণ মানুষকে। সেই দুর্দশার ছবি কি তবে শিল্পীমনে ধরা দিয়েছিল? খালেদ চৌধুরীকে পড়লে এমন একটা ভাবনা মনে আরও বেশি দানা বাঁধে। খালেদ চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৪০-এর পর এইচ এম ভি-তে রেকর্ড শুরু করেন দেবব্রত বিশ্বাস। কিছুদিন বাদেই বাধা পান। 'রেকর্ড কোম্পানী বললেন, এসব গান চলবে না। আধুনিক গান রেকর্ড করতে হবে।' দেবব্রত রাজি হননি। অনেকদিন গান রেকর্ড বন্ধ রাখেন।

১৯৬১ সালে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'-এ গান গাইতে শুরু করেন। গান পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে শিল্পীর যে একটা নিজস্বতা ছিল, উপরের ঘটনা থেকে তা বুঝতে পারা যায়। আধুনিক গান যে জীবন থেকে পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন দেবব্রত, তা কিন্তু নয়। আকাশবাণীতে নীহারবিন্দু সেনের (১৯০৪-১৯৮৯) সুরে কয়েকটি আধুনিক গান গেয়েছিলেন। নীহারবন্দু সেনের ঢাকায় জন্ম। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে সঙ্গীত বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। অনাদিকুমার দস্তিদার ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার দুজনের কাছেই তিনি গান শিখেছেন। হিমাংশু দত্তের সুরে গান গেয়েছেন। 'গীতবিতান' এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় ছিল।

বাড়িতে তখন একটা ছোটো হারমোনিয়ামে গান গাইতেন দেবব্রত। ধীরে ধীরে স্বরলিপি দেখে গান গাইতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের গান বাড়িতে তিনি নিয়মিত গাইতেন। বেশ ভোরে উঠে গাইতেন। শান্তিনিকেতনে যেতেন যখন, স্বরলিপি সংগ্রহ করে খাতায় লিখে নিয়ে আসতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকে বরাবরই তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে এবিষয়ে অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। স্বরলিপি বিষয়ে বইয়ে আমরা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমিতাভ চৌধুরীর অভিমত যোগ করেছি। স্বরলিপি 'অনুসরণ' নিয়ে দুরকমের মত দেখা যায়। দেখা যায় বলেই তো বিতর্ক দানা বাঁধে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতাভ চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী এঁরা একরকম করে ভেবেছেন। খালেদ চৌধুরী এবিষয়ে বলেছিলেন,

"রবীন্দ্রসঙ্গীত...কোথায় যেন কোন মন্ত্র আছে তার একচুল এদিক-ওদিক হলেই 'গেল গেল' রব ওঠে। যাঁরা সেই মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন, যেন তাঁরাই একমাত্র ধারক ও বাহক।...সীমিত জ্ঞান নিয়ে এটা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞরা নিজেরা যখন গান করেন তখনও স্বরলিপির সঙ্গে অনেক তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।"

খালেদ চৌধুরী বলেছেন, স্বরলিপি হল একটা ছাঁচ। বাকিটা নির্ভর করবে যে গাইবে বাজাবে তাঁর শিল্পীসত্তার উপর। তাঁর সৃজনক্ষমতা ও সততার উপর। তাঁর কথায়, 'পাশ্চাত্যসঙ্গীত নিয়ে যেটুকু নাড়াচাড়া করেছি দেখেছি যত বড় বড় Composer আছেন, তাঁরা পছন্দ বা অভিমান করতে পারেন কারো বাজনা শুনতে, তবে এটা কখনও বলেননি যে এটা করা চলবে না।...সমর্থকেরা উঠে পড়ে লাগলেন সেটা আটকাবার জন্য, এমনটি কোথাও হয় না...।'

একবার তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত যেভাবে গাওয়া হয় এটা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।...রবীন্দ্রনাথের একটা গান, তাতে বলের কথা আছে, শক্তির কথা আছে, 'বল দেখি তুই কারে আপনি অবশ হলি'। যিনি গাইছিলেন তার গলায় গানটা শুনে মনে হচ্ছিল যেন বল নিয়ে খেলা করছেন। কিছু না বুঝে গান গাইছেন। এটা ক্রিকেট বল না কীসের বল? শক্তির ব্যাপার। সেটা বুকের মধ্যে, শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করবে না? যে গানের যে স্পিরিট সেভাবে না গাইলে কেমন লাগে? 'বাঁধন যে তোর শক্ত হবে'...এইসব কথা শ্লথ গলায় গাইলে কেমন লাগে?"

খালেদ চৌধুরী শ্রীহট্ট থেকে কলকাতায় ১৯৪৪ সালে এসেছেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি রয়েছেন কলকাতায়। ১৯১৯ সালে তাঁর আসামের করিমগঞ্জে জন্ম। ভাবতে বিস্ময় লাগে, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি পনেরো হাজার গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেন। দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি বই 'অন্তরঙ্গ চীন' ও 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বইয়ের প্রচ্ছদ তিনিই করেছেন। নানাভাষার গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন। তাঁর চর্চার বিষয় চিত্রকলা, রেখাচিত্র ও লোকসঙ্গীত। মঞ্চসজ্জায় তাঁর নৈপুণ্য ইতিহাস তৈরি করেছে। 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চ, সঙ্গীত, পোশাক, বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ—সবকিছুর দায়িত্বেই ছিলেন খালেদ চৌধুরী। এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, এমন নির্মোহ ব্যক্তিত্ব আজকাল চোখেই পড়ে না। 'বহুরূপী'র সকল প্রযোজনা যা নাট্য ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছে, তাঁর হাতের ছোঁয়া ও চিন্তার প্রয়োগ সেখানে ছিল। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, কুমার রায় তো ছিলেনই।

সুচিত্রা মিত্র। তিনিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক কিংবদন্তী শিল্পী। গণনাট্য সংঘের আন্দোলনে তাঁর অবদান শীর্ষস্থানীয়দের সঙ্গে তুলনীয়। সুচিত্রা মিত্র বলেছেন, জর্জ তাঁর চেয়ে চৌদ্দ বছরের বড়ো ছিলেন। তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। জর্জ 'দিদিমণি' বলে সম্বোধন করতেন। আই পি টি এ-র সময় থেকেই দুজনের পরিচয়। গণনাট্য সংঘের নানা গানের মহড়া চলত জর্জদার ঘরে। সেখানে থাকতেন বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), হেমন্ত, ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, দুজনে কতো গান যে একসঙ্গে গেয়েছেন তার হিসেব নেই। কিছু গান শ্রোতারা এই দুই কণ্ঠের মিলন ছাড়া সেসময় ভাবতেই পারতেন না। 'নৃত্যের তালে তালে', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' বহুবার দুজনে

একসঙ্গে গেয়েছেন। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, 'ফ্যাশিবিরোধী মিছিলে সেই সময় গাওয়া জর্জ বিশ্বাস ও সুচিত্রার গান কে ভুলতে পারে? ...উমা (সেহানবীশ) ও সুচিত্রাকেও আমরা মহিলা সমিতির কাজে, বস্তির কাজে টানলাম।' এই প্রজন্মের কাছে গল্পগাঁথা মনে হতে পারে। তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই। সুচিত্রা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। সেখানে লুকিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'নিউ এজ' বিক্রি করেছেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় মজা করে তাঁকে 'লাল সেলাম' জানাতেন। পরিণত বয়সে গল্প উঠলেই সুচিত্রা বলতেন, 'আমার পিঠে পুলিশের লাঠির দাগ বুঝি আজও আছে।'

ছেচল্লিশ সাল। কলকাতা দাঙ্গার শহর হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্টরা দাঙ্গা প্রতিরোধে নেমে পড়লেন রাস্তায়। রাজাবাজারে ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে সুচিত্রা গাইছেন, 'সার্থক জনম আমার'। বন্ধু কলিম শরাফী গাইছেন, 'শুনো হিন্দুকে রহনে ওয়ালে তুম শুনো শুনো।' রাজাবাজারের ফুটপাতে চায়ের দোকান থেকে চা এঁরা কম খেয়েছেন নাকি? রবীন্দ্রনাথের সুর-স্বর-স্বরলিপি বিষয়ে তাঁর ভাবনা কেমন ছিল আমরা দেখে নেব। 'পরিচয়' (পৌষ ১৩৫৪, ইংরেজি ১৯৪৭ হবে) কাগজে সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের (তখনও 'মিত্র' হননি তিনি। বাবার পদবিই লিখছেন) লেখা বেরোল। বলতে পারা যায়, বেশ ঝাঁঝালো লেখা। বম্বে টকিজ রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ছবি করেছে। যেভাবে গান গাওয়া হয়েছে, সুচিত্রার পছন্দ হয়নি। অভিনেত্রী যে ভাবে গান গেয়েছেন, সুচিত্রার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাহাড়ী সান্যালের গান শুনে তিনি বললেন, 'তাঁর অবশ্য স্বাভাবিক একটা ক্ষমতা আছে বেসুরো গাইবার।' অনাদিকুমার দস্তিদারও সুচিত্রার তীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। এ. এল. প্রোডাকসন্স 'ঘরোয়া' নামে একটি ছবি করেছিল। অনাদিকুমারের তত্ত্বাবধানে সেখানে 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' গানটি ছিল। সুচিত্রা মিত্র কী বলেছিলেন দেখুন :

'এমন মেজাজী গানটিকে তবলার ছন্দে বেঁধে দিয়ে, অনাদিবাবু গানটির প্রতি রীতিমত অবিচার করেছেন। এর উত্তরে অনাদিবাবু হয়তো স্বরলিপির কথা তুলবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান কি নেই যা একেবারে খাঁটি স্বরলিপি মাফিক গাওয়া হয় না? আমার বক্তব্য হচ্ছে, অনাদিবাবু প্রভৃতি যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আওতায় থেকেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী শিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক রূপ আমরা জানতে চাই, শিখতে চাই। স্বরলিপি তো আছেই—কিন্তু স্বরলিপিতে গানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

অলংকারগুলি পাওয়া সম্ভব নয়। স্বরলিপিতে গানের সুর পাওয়া যায়, তাল পাওয়া যায়, কিন্তু গানের মেজাজ পাওয়া যায় না। সে মেজাজ গায়ককে সৃষ্টি করে নিতে হয়। 'বন্ধু রহ রহ সাথে' বা 'বাজে করুণ সুরে'র মত গানগুলি অনাদিবাবু কি ঠিক স্বরলিপি মাফিক গাইবার পক্ষপাতী?'

খালেদ চৌধুরীর কথায় আর সুচিত্রা মিত্রের কথায় আমরা বিশেষ কোনো ফারাক খুঁজে পাচ্ছি না। স্বরলিপি 'কাঠামো' না 'গানের প্রাণ', সেই জরুরি কথাটা কে বলবেন? বলা কি যায়?

গণনাট্য সংঘের আন্দোলনে এসে দেবব্রত শ্রীহট্টের এক শীর্ণকায় যুবককে পেয়ে যান। তিনি হেমাঙ্গ বিশ্বাস। দুজনের সখ্য ছিল গভীর। গণনাট্য আন্দোলন পরিচালনায় হেমাঙ্গ ছিলেন 'আপোষহীন'। তাঁর কখনো ধারণা ছিল না, একা কেউ এতো ভাল 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গাইতে পারেন। দেবব্রত তো তখন গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানগুলিতে যাচ্ছেন। ফিরে এসে নিজের ঘরে হারমোনিয়াম খুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাবা ছিলেন ছোটো জমিদার। ছোটোবেলা থেকে হেমাঙ্গ গান ভালোবাসতেন। প্রধানত লোকগানে মন আলোড়িত হত বেশি। একটু বেশি বয়সে হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মন ও অজয় ভট্টাচার্যের প্রভাব পড়েছিল। আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কে. মল্লিকের গ্রামোফোন রেকর্ড যে খুব চালু ছিল, দেবব্রতের মতো তিনিও লিখেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে স্কুলে হেমাঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন। নজরুলের গানও তাঁর ভালো লাগত।

বলা দরকার, ১৯১১ সাল বাংলা সংস্কৃতির তিন সেরা জীবনের জন্ম দিয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

দেবব্রত বিশ্বাসের গণসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দুই-ই শুনেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। যাঁরা তাঁর এই দুই সত্তাকে আলাদা করে দেখতে চাইতেন, হেমাঙ্গ তাদের 'গোঁড়া' বলেছেন। ১৯৪৩ সালে দেবব্রতর গান শুনে হেমাঙ্গ সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। দেবব্রত লিখেছেন, তাঁর কোনো কোনো বামপন্থী বন্ধু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া পছন্দ করতেন না। 'প্যানপ্যানানি' গান। একবার দেবব্রত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র এক অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন। তখন ওই বন্ধুরা তাঁর কাছে এসে ভুল স্বীকার করেন। পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। দেবব্রত তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'-এ লিখেছেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনেকদিন ধরেই এখানে ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এত প্রাণ, তিনি আগে তা বুঝতে পারেননি। হেমাঙ্গের কথা শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' গড়ে উঠেছে, সেকথা আগে বলা হয়েছে। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস হয়েছিল। একটি সাংস্কৃতিক দল বাংলা থেকে বোম্বাইতে পাঠানো হয়। এই দলে ছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস।

১৯৫৫ সাল। আসামে গণনাট্য সংঘের তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছিল। প্রচুর শ্রোতা সামনে। দেবব্রত ধরলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো'। গান শেষ হল একসময়। ফেব্রুয়ারির শীতে আসাম কাবু হয়ে যায়। তবু মনে হল সকলের, বসন্ত ঋতু এসেছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, গণনাট্য সংঘের প্রথম দিকে দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন সমবেত গানের পরিচালক। গাইতেন সমবেতভাবে। জনতার বুকে ঢেউ তুলত সেসব গান। ১৯৪৮ সালে আমেদাবাদ শহরে গণনাট্য সংঘের সপ্তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে পনেরো হাজার গুজরাটি শ্রোতার সামনে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশিত হল। সমবেত জনতার মধ্যে ঢেউ উঠে গিয়েছিল।

১৯৪৬/৪৭ সালে দেবব্রত বিশ্বাস শিলং-এ যান। তখন 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় ব্রেথওয়েট কারখানায় শ্রমিকের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি কবিতা লিখেছিলেন। 'জবাব চাই, জবাব চাই, / ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই'। এর পুরোপুরি সুর করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। ভাবতে খারাপ লাগে, আজ সেই সঙ্গীতের সুর হারিয়ে গিয়েছে। ১৯৪৮ সালে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' ভেঙ্গে 'বহুরূপী' তৈরি হয়। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু এঁরা আলাদা করে দল তৈরি করেন। ওইসময় শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় 'তাসের দেশ' অভিনীত হয়। দেবব্রতর কণ্ঠে শেষ গান— 'ভাঙো, বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও, ভাঙ্গো'। অকল্পনীয় উন্মাদনা তৈরি করেছিল এই গান।

একদিকে উন্মাদনা। একদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'মান মর্যাদা' বলে কিছু রইল না। হৃদয় উজাড় করে কতো গান দেবব্রত গেয়েছেন, তার তালিকা পরে এই বইয়ে দিয়েছি।

'বাধা' বুঝি তাঁর নিত্যদিনের ঘটনা। 'কলম্বিয়া রেকর্ডস' থেকে পরপর বেশ কিছু গান বেরিয়েছে। বিখ্যাত সব গান। এ শুধু অলস মায়া / আজ আকাশ পানে তুলে মাথা / আমি চঞ্চল হে / দিনপরে যায় দিন / এমনি করেই যায় যদি দিন / চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে / তুমি রবে নীরবে / ওগো পথের সাথী। বিশেষ করে দুটো গানের তুলনা হয় না। 'আমি চঞ্চল হে' ও

'তুমি রবে নীরবে'। সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গলায় গাওয়া এই দুটি গানের কথা বারবার বলতেন। তৃপ্তি মিত্র বলতেন।

প্রথম বাধা দিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার। যে গানের এতো প্রশংসা, 'তুমি রবে নীরবে', অনাদিকুমার অনুমোদন দিতে রাজি হননি। তাঁর অভিমত, 'গীতবিতান' এ লেখা রয়েছে—মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন। দেবব্রত 'সফল' এর বদলে 'সকল' গেয়েছেন। ভুল কথায় গাইলে অনুমোদন হবে কেমন করে?

দেবব্রত অনাদিকুমারকে বললেন, 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় 'সকল' কথাটা রয়েছে। তিনি স্বরলিপি দেখেছেন। অনাদিদা বললেন, 'ওটা ভুল'। দেবব্রত ছাড়বার পাত্র নন। জানালেন, উত্তর যদি 'ভুল' থাকে, এক বছরে সংশোধন হয়নি কেন? অনাদিদাও নাছোড়বান্দা। অনুমতি তিনি দেবেন না। দেবব্রতর বন্ধু ছিলেন নীহারবিন্দু সেন। তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখে 'আসল রহস্য' জানতে চাইলেন। ইন্দিরা দেবব্রতের পক্ষেই মত দেন। দেবব্রত তারপর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সব কথা নৃপেন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে বুঝিয়ে বলেন। এঁরা অনাদিকুমারকে বলতে তারপর দেবব্রতর ওই গান ছাড় পায়।

'কলম্বিয়া রেকর্ডস' থেকে পরের পর্যায়ে আরও বেশ কিছু গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছে। এখানে আর আলাদা করে তালিকা দেওয়া হয়নি। পরে সব তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কলিম শরাফীর নাম বলছিলাম। তাঁকে নিয়ে এক আশ্চর্য কাহিনি রয়েছে। সে কাহিনিতে যাওয়ার আগে মানুষটির পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজন। কলিম শরাফী ১৯২৪ সালে বীরভূমে জন্মেছেন। ১৯৪২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে একবছর জেল খাটেন। ধীরে ধীরে এই সুদর্শন যুবক বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছেন। গলায় সুর ছিল। উদাত্ততা ছিল। গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে তিনিও গানে মাতিয়ে দিতেন সকলকে। একসময় গণনাট্য সংঘ ছেড়ে নবনাট্য আন্দোলনে চলে যান। পরে আমাদের দেশ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ তৈরির পর ঢাকাতেই ছিলেন। সেদেশের বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম অভিভাবক। সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। শ্রদ্ধা পেয়েছেন। তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নভঙ্গির সঙ্গে অনেকেই জর্জ বিশ্বাসের তুলনা করেন। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় তাঁর বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শরাফী নিজের হাতে লিখে আমাকে বেশ কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিয়েছেন আমি যা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। কলিম

শরাফী সেসময় আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ২০১০ সালের ২রা নভেম্বর তিনি প্রয়াত হয়েছেন। সেই কাহিনিতে যাই এবার। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' থেকেই তুলে ধরি।

'...১৯৪৬ সনের আগস্ট মাসে কলকাতায় শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। কত নিরীহ লোক যে তখন প্রাণ হারাল তার কোনো হিসেব নেই। সেই সময়ে কয়েক মাসের জন্য শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি আমার বাড়িতে আমার পাশের ঘরেই থাকত।...আমার মা ও ছোট বোনও দোতলায় একটি ঘরে থাকতেন। দাঙ্গা যখন পুরোদমে চলছিল, হঠাৎ আমাদের গণনাট্য সংঘের একজন গায়ক-কলিম শরাফী (মুসলমান) কলকাতার বাইরের কোনো অঞ্চল থেকে আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। সে জানতই না যে কলকাতায় নারকীয় কান্ড চলছে। কলিমকে আমার ঘরেই লুকিয়ে রাখলাম। কয়েকদিন পর শহরের অবস্থার একটু উন্নতি হলে, করিম শরাফীকে একটি গান্ধি টুপী মাথায় পরিয়ে বাসে করে নিয়ে ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট পার্টি আফিসে কাকাবাবুর অর্থাৎ কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের হাতে সঁপে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।' ঢাকায় যখন গেছি, একথাটা তাঁর স্ত্রী আমায় বেশ ক'বার বলেছেন। কলকাতার সঙ্গে কলিম শরাফীর যোগাযোগ ছিল। খালেদ চৌধুরী ভীষণ বন্ধু ছিলেন।

অন্ধকারের দিনগুলি কেটে যায় একসময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামল। কলকাতার দাঙ্গাও থামল একসময়। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির নতুন ঠিকানা হয়েছে ৪নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। অফিসে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি তাঁর মাকে হারালেন। সব মিলিয়ে মন ভালো নেই। সবার অনুরোধে পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং গেলেন। ওই সময়ের একটি ঘটনার কথা আমাদের না বললে চলবে না। একটা মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বুঝতে পারব আমরা।

স্নেহাংশু আচার্য তখন কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য। জমিদার বাড়ির এই ছেলেটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট আদর্শে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর একটি চিঠি নিয়ে একজন দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন। শিলিগুড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির আর্থিক সঙ্গতি বলতে কিছুই নেই। কমরেডরা দল চালাতে পারছেন না। একটা গানের অনুষ্ঠান করে কমিউনিস্ট পার্টি কিছু টাকা তুলতে চাইছে। দেবব্রত যদি এই অনুষ্ঠানে গান করেন তবে ভালো হয়। এক আশ্চর্য মানুষ এই শিল্পী। স্নেহাংশুবাবুকে চিঠি লিখে বললেন, 'রাজি আছি। যে ধরনের গান গাইব, যে কোনো সময় খুন হয়ে যেতে পারি।

আপনি যদি লুকিয়ে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মঞ্চের পাশে থাকেন, আমি গান গাইব।' তিনি রাজি। শ্যালিকা সুচিত্রাকে (স্নেহাংশু আচার্য তাঁর দিদি সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলেন) নিয়ে স্নেহাংশুবাবু শিলিগুড়িতে হাজির। অনুষ্ঠান হল। সুচিত্রা গাইলেন। দেবব্রত গাইলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গণনাট্যের গান দুই-ই গাইলেন। স্নেহাংশুবাবু দেবব্রতবাবুর কথা রক্ষা করতে গোপন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সারাক্ষণ পাশে ছিলেন।

১৯৪৭ সাল। দেশটা দুভাগ হল। দুভাগেরই স্বাধীনতা ঘোষিত হল। দেবব্রত দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি। দেশভাগের গভীর ছাপ বহু মানুষের উপরেই পড়েছিল। সংস্কৃতি আন্দোলনের তিন বড়োমাপের মানুষকে সারাজীবন আমরা এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখেছি। দেবব্রত বিশ্বাস। ঋত্বিক ঘটক। বিজন ভট্টাচার্য। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে দেশভাগের যন্ত্রণা প্রায় সকল ছবিতেই ফুটে উঠেছে। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' তো এবিষয়ের এক জীবন্ত দলিল।

১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি একটা সময়ে দেবব্রত বিশ্বাস বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির এক গোপন সভায় যোগ দিয়েছিলেন। পি সি যোশী ছিলেন তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক। দেবব্রতকে চিনতেন কমরেড যোশী। তাঁর অনুমতি নিয়ে দেবব্রত সেই মিটিং-এ যোগ দেন। সেখানে বিনয় রায় ছিলেন। নিরঞ্জন সেন ছিলেন। বি টি রনদিভে বক্তা। বুঝতে পেরেছিলেন দেবব্রত, কমিউনিস্ট পার্টি তার আগের ভাবনা বদলাচ্ছে।

১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি একবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ সালেই 'বহুরূপী'-র জন্ম হল। যত্ন করে শম্ভু মিত্র একের পর এক প্রযোজনা তৈরি করেছেন। গণনাট্য সংঘ রক্ষা করতে তিনি কী ভূমিকা পালন করতে পারতেন, সে আলোচনায় আমরা যাব না। তবে তাঁর প্রযোজনার উপস্থাপনায় কোনো ত্রুটি থাকত না। শাঁওলী মিত্র 'শম্ভু মিত্র' বইয়ে লিখেছেন, পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর শম্ভু মিত্র শুধু নিজেকে রক্ষা করতে পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেউ কেউ নাকি এমন অভিযোগ করেন। শ্রীমতী মিত্র তারপর লিখলেন '...শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘের সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকলে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়েছে ১৯৪৯-এ!' দেবব্রত বিশ্বাসের বিবৃতির সঙ্গে মিলছে না। 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'-এ 'মুজফ্ফর আহমদ'-এর জীবনীতে লেখা রয়েছে, '২৫.৩.১৯৪৮ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে নিবর্তনমূলক আটক আইনে তিনি (মুজফ্ফর আহমদ) ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত আটক থাকেন।' বহুরূপীর জন্ম ১লা মে ১৯৪৮।

'বহুরূপী'-র সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল না। সম্পর্ক কারও সঙ্গেই তাঁর খারাপ হয়নি। 'চার অধ্যায়' প্রযোজনার সময় "...অভিনয়ে প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের শেষে একটু সুরের দরকার ছিল যার শীর্ষ বিন্দুতে 'বন্দেমাতরম' কথাটি জিগির দেওয়ার মতো আসবে। সে সুর রচনা করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস" ('রক্তকরবী'তে সঙ্গীত প্রয়োগ — শম্ভু মিত্র)। 'বহুরূপী'-র প্রযোজনায় একটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন দেবব্রত। সে নাটকের নাম 'ছেঁড়াতার'। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। 'বহুরূপী'র প্রথম নাট্যোৎসব হয় ১৯৫০ সালে। বাংলাদেশের প্রথম নাট্যোৎসব। উৎসবের তৃতীয় দিন (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫০) সকাল দশটায় নিউ এম্পায়ার হলে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'ছেঁড়া তার' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তালিকা ছিল এরকম :

মহিম ; দেবব্রত বিশ্বাস
রহিম : শম্ভু মিত্র
হাকিমুদ্দি : তুলসী লাহিড়ী
কুক্‌ড়া ও শিয়ালু : গঙ্গাপদ বসু
প্রেসিডেন্ট : মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রীমন্ত : মহম্মদ ইসরাইল
সরে মামুদ : অমর গাঙ্গুলী
গোবিন্দ : সবিতাব্রত দত্ত
মামুদ : শোভেন মজুমদার
কানা ফকীর : পারিজাত বসু
দারোগা : নির্মল চ্যাটার্জী
ফুলজান : তৃপ্তি মিত্র

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুদিন পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 'মুক্তধারা' নাটকে অভিনয় করেন তিনি। সম্ভবত এই তাঁর প্রথম অভিনয়। কঙ্করের অত্যাচারী লেফটেনান্টের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন।

যিনি অসাধারণ গাইতেন, যাঁর নেতা হিসাবে কাজ করার অনেক গুণ ছিল, সেই বিনয় রায় সপরিবারে রাশিয়া চলে যান। মস্কো রেডিওতে বাংলা খবর পড়ার কাজ নেন। গণনাট্য সংঘ সে অবস্থায় যতটুকু কাজ করতে পেরেছে, দেবব্রত বিশ্বাসের ভূমিকা দেখলে আমাদের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। পার্টি তখন নিষিদ্ধ। যতটুকু কাজ করা যায়, সবই গোপনীয়তা মেনে করতে হচ্ছে। একদিন দেবব্রত একটি চিঠি পড়ে জানলেন, পার্টির জন্য টাকা তুলতে হবে।

যে কোনো অনুষ্ঠান তো তখন করা যাবে না। ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' হবে। পুলিশ নিশ্চয়ই এর অভিনয় বন্ধ করবে না। অভিবাদন জানাতে হয় আরও অনেককেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন। সুচিত্রা এগিয়ে এলেন। 'অর্জুন' আর 'চিত্রাঙ্গদা' পাওয়া গেল। পঙ্কজ মল্লিকের পর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 'হিরো' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর 'হিরোইন্' সুচিত্রা মিত্র—একথা দেবব্রত নিজে লিখেছেন।

বছর তিন দুঃসহ পরিবেশে কাটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল। বন্দীদশায় সব কাজ যে থেমে ছিল এমনটা নয়। তবু কিছু না কিছু অসুবিধা তো হয়েছেই।

১৯৫৩ সালে সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে দেবব্রত চীনে গেলেন। ফিরে এসে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখলেন। অনেক পরে সেই লেখাগুলি বই হয়ে বেরোল। বইটি নিয়ে আমরা একটি আলাদা পরিচ্ছেদ রচনা করেছি। ১৯৫৫ সালেও দেবব্রত আর একবার চীনদেশে গিয়েছিলেন। সে বিষয়ে বিশেষ কোথাও কিছু লেখেননি। দুবছরে চীনদেশের আর এমনকী বদল হয়েছে। নতুন কী লিখতে পারতেন তিনি? হয়তো তাই কলম ধরেননি।

১৯৪২ সালে দেবব্রত বিশ্বাস মা আর ছোটোবোন ললিতাকে নিয়ে ১৭৪ই, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে উঠে আসেন। দু-তলা বাড়ি। বাড়িতে দিন রাত গুণীজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। কাকে বাদ দিয়ে কার নাম লিখব?

এপ্রিল মাস ১৯৫৮ সাল। রেঙ্গুন শহর তখন কলকাতার মতোই নানা ধরনের সংস্কৃতিচর্চা করে। হয়তো কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তবু ক্ষতি কিছু নেই। রেঙ্গুনে 'বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কবি ও অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু। পূর্ববঙ্গের লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও লোকগানের গায়ক মমতাজ আলি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ছিলেন লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করে কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২২ সালে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় যোগদান করেন। দৈনিক সংবাদপত্র 'আজাদ'-এর ১৯৪০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড দেখে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। 'পূর্ব পাকিস্তান পুনর্জাগরণ সমিতি'-র সভাপতি ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন। 'অতীত জীবনের স্মৃতি' নামে তাঁর একটি অসাধারণ আত্মজীবনী রয়েছে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে যে পুরস্কার দিয়েছিল, ১৯৬৯

সালে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছে।

এক সপ্তাহ (৪-১১ এপ্রিল) রেঙ্গুনে ছিলেন সকলে। বিমানে ফেরার সময় 'এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমায় নমস্কার জানিয়ে তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম চণ্ডীচরণ সাহা।' দেবব্রতকে তিনি আরও জানান, কনক বিশ্বাস ও অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন ধরেই পরিচয় আছে।

বোধহয় এদেশে কোনো কাজই যথাগতিতে এগোয় না। চণ্ডীবাবু দেবব্রতর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে দেবব্রত গান করবেন। এইচ এম ভি-তে অনেকবছর আগেই রেকর্ড করা বন্ধ করেছেন। সেই চণ্ডীবাবু শিল্পীর কাছে এলেন প্রায় দুইবছর পর। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে। সঙ্গী ছিলেন একজন। জগদীশ চক্রবর্তী। দেরি করে এসেছেন বলে কোথায় দেবব্রতর কাছে দুঃখ প্রকাশ করবেন, তা না করে উল্টো আক্রমণ। 'চণ্ডীবাবু তোমায় যে বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করবেন, তুমি দেখা করোনি কেন? 'তোষামোদ' তাঁর ঠিকুজিতে নেই। উত্তর দিলেন চটজলদি। 'গান গাইব বলেছিলাম, দেখা করব তো বলিনি!'

এইচ এম ভি-তে দেবব্রত রেকর্ড করছিলেন না যদিও, ওই কোম্পানির সঙ্গে দেবব্রতর একটা চুক্তি ছি[illegible]। চুক্তির মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি। দেবব্রত চণ্ডীবাবু ও জগদীশবাবুকে বললেন, আপনাদের দুটো জিনিস করতে হবে।

এক. এইচ এম ভি থেকে আমার গান গাইবার বিষয়ে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

দুই. দুটো গান করব। 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'। 'যেতে যেতে একলা পথে'। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে গান দুটো আপনাদেরই পাঠিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

গান রেকর্ড না করে বহুদিন বসে ছিলেন দেবব্রত। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে উপরের দুটো গান নিয়ে দেবব্রতর রেকর্ড বেরোল।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানটি যেন দেবব্রতর কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। মন্দ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে এই গানটির বিস্তার ও ব্যাপ্তি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। প্রবীণদের মুখে শুনেছি, রোয়াকে বসে আড্ডা দিতে দিতেও ছেলেরা এই গান গেয়েছে একসময়। গানটির বিষয়ে এক অসাধারণ আখ্যান শুনিয়েছেন শিল্পীর ছাত্র অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। বইয়ে তাঁর লেখা নিবন্ধে সেটি রয়েছে।

ওই সময় কমল দাসগুপ্তের সুরে শৈলেন রায়ের লেখা দুটি গান ('তোরা

যে জাত বাঙালী' ও 'দেশ ভেঙেছে তাই') রেকর্ড করেছিলেন দেবব্রত। শিল্পী নিজেই বলেছেন, এই গান শ্রোতাদের ভালো লাগেনি।

বাংলার আপামর জনতা দেবব্রতকে রবীন্দ্রগানের শিল্পী হিসাবে দেখতে চাইছে। দেবব্রতও একের পর এক রেকর্ড করে চলেছেন। সেই রেকর্ডের বিক্রি নিয়ে কোম্পানিকে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে যাঁরা ছিলেন সে সময়, তাঁর কোনো গান নিয়ে আপত্তি তুলেননি।

১৯৬১ সাল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের বছর। সে বছর সারা দেশ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছে। বাংলায় প্রচুর স্মরণানুষ্ঠান হয়েছে। তবে পার্ক সার্কাস ময়দানে বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যবস্থাপনায় কয়েকদিন ধরে যে রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠান হয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। দেবব্রতকেও সেবছর যেতে হয়েছে নানা জায়গায়। নানা সময়ে নানা শিল্পীরা তাঁর সঙ্গী থেকেছেন। জর্জদাকে নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা কম হয়নি। নানা জনের স্মৃতিচারণায় সে কথা ফুটে উঠেছে।

তখন বিশ্বভারতী সঙ্গীত পর্ষদ-এ অনাদিকুমার দস্তিদার ছিলেন। শরীর খুব খারাপ যাচ্ছিল। ১৯৬৩ সালে তিনি রেকর্ড অনুমোদন করার কাজ থেকে অব্যাহতি চাইলেন। দেবব্রত লিখেছেন, মিউজিক বোর্ড তখন 'দুজন শান্তিনিকেতন থেকে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর' ওপরে এ কাজের ভার চাপালেন।

অনাদিকুমার দস্তিদারের কী যোগ্যতা ছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য অনাদিকুমার। সঙ্গীতবিচারে তাঁর কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। 'যথার্থ' কে 'যথার্থ' বলতে ঠোঁট কাঁপেনি।

১৯৬৪ সাল। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি চিঠি এল হিন্দুস্থান রেকর্ডস-এ। সেই চিঠি রেকর্ড কোম্পানি শিল্পীকে পাঠায়। শিল্পী বিস্মিত!

চিঠিগুলি আমরা পরে দিয়েছি। তাই এদের বিস্তারীত আলোচনায় যাব না। রেকর্ড কোম্পানি মিউজিক বোর্ড থেকে যে চিঠি পেয়েছিল তার একটি কপি দেবব্রতকে পাঠানো হয়। সেই হল যুদ্ধের শুরু। মিউজিক বোর্ডের চিঠির তারিখ ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৪। চারটি গান রেকর্ড করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল।

১. শুধু যাওয়া আসা

২. এসেছিলে তবু আস নাই

৩. মেঘ বলেছে যাব যাব

৪. গোধূলি গগনে মেঘে

'১' নম্বর ও '৪' নম্বর গান অনুমোদন পেলেও '২' ও '৩' নম্বর গান পেল

না। কেন? '২' নম্বর গানের 'মিউজিক ইন্টারল্যুড' নিয়ে প্রশ্ন। '৩' নম্বর গানে নাকি 'মেলোড্রামাটিক' কণ্ঠস্বর। প্রতিধ্বনির প্রয়োগে গানের সূক্ষ্ম কাজ চাপা পড়ে গিয়েছে।

কী করবেন দেবব্রত? চিঠিটি নিয়ে একদিন মিউজিক বোর্ডের অফিসে গেলেন। ওখানকার প্রতিনিধিকে বললেন, 'মেলোড্রামাটিক কণ্ঠস্বর' কী, 'মিউজিক ইন্টারল্যুড' কী — বুঝিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কোথায় কী বলেছেন, বলে দিলে ভালো হয়। যাই হোক, রেকর্ড কোম্পানি যাতে অনুমতি পায়, তার চেষ্টা ওই প্রতিনিধিরা করবেন বলে শিল্পীকে আস্বস্ত করেন।

দিন যায়। একদিন এক খ্যাতিসম্পন্না রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রতর কাছে আসেন। মিউজিক বোর্ড তাঁকে গানগুলির বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি বললেন, 'এসেছিলে তবু আস নাই', গানটিতে খানিকটা ভুল আছে। শুধরে দিলেই চলবে। কী ত্রুটি? 'চঞ্চল চরণ ঘাসে ঘাসে' লাইনটি গাইবার সময় 'চন্' কথাটা স্বরলিপি মেনে চলেনি। দেবব্রতর কথায়, 'তখন আমি তাঁকে ওই জায়গাটি গেয়ে শোনাতে বললাম এবং তিনি নিজে গেয়ে শোনালেন।'

দেবব্রত সঙ্গীত ব্যাকরণের শব্দ উচ্চারণ করে ওই গায়িকার ভুল ধরিয়ে দিলেন। তবে বললেন, প্রবীণ দু-একজন গায়ক-গায়িকার মত নিয়ে পরে জানাবেন। 'বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড' প্রথম যে চারজনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁরা হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ। ইন্দিরা দেবী ১৯৬০ সালে প্রয়াত হয়েছেন। এই চারজনই ছিলেন দেবব্রতর চেয়ে বয়সে বড়ো। এদের সঙ্গীতে হাতেখড়ি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে। তাঁদের পরামর্শ নিশ্চয়ই তিনি মানবেন।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে শান্তিদেব ঘোষ হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিতে এলেন। দেবব্রত তখন তাঁকে 'এসেছিলে তবু আস নাই' বাজিয়ে শোনান। কোথায় মিউজিক বোর্ড ভুল ধরেছে সে কথাও জানানো হল তাঁকে। শান্তিদেব স্পষ্ট করে বললেন, কোনো ভুল হয়নি। এমনকী তিনি লিখেও দিলেন, 'এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। আমার মনে হয় ছাপার কোন গোলমাল ঘটেছে।'

শিল্পীর একটি বিষয় আমাদের খানিকটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কোম্পানিকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, রেকর্ড নিয়ে কোনো বিজ্ঞাপনের বাড়াবাড়ি যেন না হয়। সমালোচনার জন্য কোনো পত্র পত্রিকায় যেন না পাঠানো হয়। পত্রপত্রিকায় *সমালোচনা কেমন হয়, তিনি কমবেশি জানেন। এমনকী তিনি রেকর্ডে ছবিও*

দিতেন না। আমাদের ধারণা, গণনাট্য সংঘের শিক্ষা, সংঘবদ্ধতার শিক্ষা তাঁকে এমন কথা বলতে শিখিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে একবার একটি রেকর্ডের সমালোচনা খবরের কাগজে বেরোল। ভালো মন্দের কথা নয়, 'না' করার পরেও যাবে কেন? রেকর্ড কোম্পানিকে কড়া চিঠি দিলেন ক্ষুব্ধ শিল্পী। রেকর্ড কোম্পানি বিনয়ী প্রত্যুত্তরে জানাল, ভবিষ্যতে আর এমনটি ঘটবে না। মনে রাখবেন পাঠক, দেবব্রতের রেকর্ডের বিক্রি এর জন্যে কখনও কমে যায়নি। খালেদ চৌধুরী একবার উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন, সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর রয়ালটির তালিকায় দেবব্রত বরাবর শীর্ষে। তাঁকে নিয়ে সমালোচনা হবে না তো কাকে নিয়ে হবে?

১৯৬৪ সালের পর বছর পাঁচ মিউজিক বোর্ড আর কোনো কিছু বলেনি। ১৯৬৯ সালের ২৫শে জুলাই মিউজিক বোর্ড পরের চিঠিটি পাঠাল। অভিযোগ একইরকম। দুটি গান অনুমোদন করা যাচ্ছে না।

১. পুষ্প দিয়ে মার যারে

২. তোমার শেষের গানের

কী অভিযোগ? '১' নম্বর গানে উচ্চকিত বাদ্যযন্ত্র। গানের মেজাজকে নষ্ট করেছে। '২' নম্বর গান বিষয়ে অভিযোগ আরও বেশি। 'লয়' যা হবার, তার চেয়ে দ্রুত। বাজনা বড্ড বেশি। আরও গুরুতর অভিযোগ, স্বরলিপি মেনে এই গান গাওয়া হয়নি।

এবার দেবব্রত ঠিকই করলেন, বড়ো আকারে চিঠি লিখবেন। লিখলেনও তাই। চিঠির তারিখ ১৬ই আগস্ট ১৯৬৯। চিঠিটি বইয়ের শেষদিকে আছে।

দেবব্রত বললেন, আপনারা যা অভিযোগ করেছেন তা 'সাবজেক্টিভ', তাই মন্তব্য করছি না। একটা সময় ছিল, কোনো শিল্পীর গানের টেপ গেলে মিউজিক বোর্ডের সদস্যরা দেখতেন, মুদ্রিত স্বরলিপি মেনে গানটি গাওয়া হয়েছে কি না। আমি রবীন্দ্রনাথের সব লেখাই পড়েছি, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর আলোচনাও শুনেছি। কোনো লেখা বা বক্তৃতায় তিনি বলেননি, 'বাজনা' কতদূর চলবে, 'লয়' কেমন হবে। মিউজিক বোর্ডে এখন 'ডিক্টেটর' এর আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে হয়। কবে থেকে মিউজিক বোর্ডে তিনি এসেছেন তা বলতে পারব না।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমি বহু বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছি, রেকর্ড করছি। আমার দায়িত্ব ও গভীরতাবোধ আর কারও চেয়ে কম রয়েছে বলে মনে করি না। পাখি আর পতঙ্গ যেমন একইরকমভাবে জীবন কাটায়, *সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিবার একইরকমভাবে গড়েন না। এঁরা সকলেই*

আমার অনুপ্রেরণা। বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমি আমার ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমি জানি না যদিও, কী করেছি ও কতদূর করেছি। আমার ধারণা, আরও বহু কাজ করা বাকি আছে। আমাকে এখন কিছুকাল বিষণ্ণতায় কাটাতে হবে। কাজে নতুন করে ফিরে আসতে আমার সময় লাগবে। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের ডিক্‌টেটরের ফতোয়া মেনে কাজ করতে হলে আরও বেশি সময় তো লাগবেই।

এখন কী আর বলতে পারি। নিবেদন করছি, মিউজিক বোর্ডকে আমার টেপের গানগুলো আরও একবার শুনতে বলবেন। আমার বয়স হয়েছে। যে কোম্পানি আমার গান টেপ করেছে, তাদের খরচ হয়েছে। বিশেষ বিবেচনা করে আমাকে কিছু বাড়তি নম্বর দিলে ভালো হয়।

কাকস্য পরিবেদনা! কোনো উত্তর পেলেন না দেবব্রত। মিউজিক বোর্ড কি একটা সময় মেনে উত্তর দিতে বাধ্য নন? অনন্তকাল ধরে রাখতে পারেন এরা? ঘটনা এই, পেরেছেন। ওই দুটি গান তাঁর রেকর্ডে বেরোয়নি। তারপর দেবব্রতকে সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হত। তিনি লিখলেন, '...রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করব না বলেই মনস্থির করলাম। রেকর্ড কোম্পানীতে যাওয়াও বন্ধ করে দিলাম।'

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি জানে, শ্রোতাদের কাছে এই শিল্পীর গানের চাহিদা কেমন। চণ্ডীবাবু একদিন তাঁর ছেলে শোভনকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেন। অনুরোধ করেন শিল্পীকে, আমরা রেকর্ড করব। আপনি গান বন্ধ করবেন না। দেবব্রত বলেন, আমি গাইব। মিউজিক বোর্ড অনুমোদন না দিলে আমি লড়াই করতে পারব না। সে কাজ আপনাদের-ই করতে হবে।

১৯৭০ সালের শেষে ও ১৯৭১ সালের শুরুতে দেবব্রত বিশ্বাস বেশ কিছু গান রেকর্ড করেছেন। শুনতে পেয়েছিলেন, কিছু গান বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড অনুমোদন দেয়নি। তাঁর এ খবরে তখন আগ্রহ ছিল না। ১৯৭১ এর পর শিল্পী আর একটিও রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেননি। জীবনের শেষ প্রান্তের একটি দশক তিনি এভাবেই কাটিয়ে গেলেন।

এই তো তোমার আলো

গণ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে মানুষের জন্ম ও বড়ো হওয়া, তিনি সমাজের অস্থির সময়ে স্থিরচিত্ত থাকতে পারেন না। বড়ো ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে দুবার ভেঙ্গেছে। তিনি তো প্রতিজ্ঞা করেইছিলেন, কোনো দলে ভিড়বেন না। প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতার লড়াই তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। বলছি বটে প্রতিবেশী দেশ, নিজের জন্মভূমিকে এমন পরিচয়ে চিহ্নিত করতে তাঁর মন চাইত না। একদিন তাই তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখে দুটি মুক্তি যুদ্ধের গান লিখতে অনুরোধ করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ সে সময় মুম্বাই ছিলেন। চিঠি পেয়ে স্বরলিপি সহ (পরিবর্তনের স্বাধীনতা দিয়ে) একটি গান পাঠান। পরে কলকাতা এসে আরও একটি গান লিখেছেন। দুটো গান আমরা পরে দিয়েছি। চিঠিতে দেবব্রত সৌম্যেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'গান দুটির রেকর্ড প্রকাশ করে এবং নানা অনুষ্ঠানে গেয়ে এপার বাংলার জনসাধারণকে বাংলাদেশের আমার ভাইবোনদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল করে তুলতে' তিনি এই অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই গান দুটি হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিতে রেকর্ড হল। দেবব্রত এবার বললেন, জোরদার প্রচার করুন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় তিনি যে আপত্তি করেছিলেন এবার তা তুলে নিলেন। নিজের খ্যাতির জন্য যে নয়, সে কথা সকলেই বুঝতে পারছেন। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু তখন আমাদের বাংলা সীমান্ত ও ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত আসছেন। অনেক মানুষই তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু সেই মানুষদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। এক সময় বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেল। ১৯৭১ সালে দেবব্রত বড়ো রকমের অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৭২ সালের প্রথমে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছেন। অসুস্থ হবার মাস কয় পর, ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠান করতে যান। ১১ই এপ্রিল ঢাকায় পৌঁছেছেন। বিকেলবেলা 'ছায়ানট' এ গান করেছেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষিকা সন্‌জিদা খাতুন ছিলেন। সন্‌জিদা বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি 'ছায়ানট' সংস্থার

সভানেত্রী। ১২ই এপ্রিল সুচিত্রা মিত্র ঢাকায় গেলেন। সেদিন পঞ্চাশ-ষাট হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে ওঁরা গান পরিবেশন করেছিলেন। অত্যন্ত পরিচিতজনের বিয়োগ ব্যথায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত ছিল।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত থেকে এক সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে দেবব্রত আবার বাংলাদেশে গিয়েছেন। অন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মঞ্জু গুপ্ত, ঋতু গুহঠাকুরতা ও পূরবী মুখোপাধ্যায়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারীও ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হয়েছে। পরে 'বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় শত্রুদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনে তিনি গান করতেই পারেননি। একটা অসম্ভব দরদী মন ছিল তাঁর। নানা জনের স্মৃতিচারণায় টুকরো টুকরো ভাবে সেসব কথা ফুটে উঠেছে। এই বইয়ের স্মৃতিচিত্রসম্ভারে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরের বছরেই আবার দেবব্রত বিশ্বাস বাংলাদেশে যান। ১৯৭৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গিয়েছিলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ফিরে এসেছেন।

তাঁর বাংলাদেশ সফর নিয়ে একটা বেশ বড়ো নিবন্ধ লিখেছেন কল্যাণ মজুমদার। সেই লেখার শিরোনাম 'বৈদিক বাউলের স্মৃতি'। লেখাটিতে তিনি কলিম শরাফীর কথাও বলেছেন। নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন শিল্পী।

চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-কে সেই সময় একটি চিঠি লিখেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। বাংলাদেশ তখনও জন্ম নেয়নি। পাকিস্তানি শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তখন লড়াই করছেন বাংলার বীর যুবা-যুবতীরা। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এদেশে। সে সময়ে 'চীন পাকিস্তান প্রীতি' নিশ্চয়ই শিল্পী ভালো চোখে দেখেননি। চীনের আদর্শে গভীর সমর্থন রয়েছে যাঁর, তিনি চীনদেশের প্রধানকে চিঠিটি লিখতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করেননি। চৌ এন লাইয়ের কথা তো শিল্পী তাঁর 'অন্তরঙ্গ চীন' বইয়ে অত্যন্ত সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন।

চৌ এন লাই ও শেখ মুজিবর রহমান - এই দুই দেশনায়কের কাছে লেখা শিল্পীর দুটি চিঠি থেকে তাঁর জীবনাদর্শের কয়েকটি বড়ো দিক প্রতিভাত হয়। চিঠি দুটো এই বইয়ে আমরা দিয়েছি।

দেবব্রত বলেছিলেন, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে তিনি আর বাদ প্রতিবাদে যাবেন না। ১৯৭২ সালের ২২শে ডিসেম্বর বোর্ড থেকে হিন্দুস্থান

রেকর্ডিং কোম্পানিতে একটি চিঠি এল। চিঠিটিতে ওঁরা জানিয়েছেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে কি কি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। বোর্ডের কর্তারা দেখেছেন, অনেক শিল্পী যথেচ্ছভাবে গানের মাঝখানে দেশি বিদেশি বাদ্যযন্ত্র উচ্চকিত স্বরে ব্যবহার করে গানের শ্রুতিমাধুর্য ক্ষুণ্ণ করছেন। বোর্ডের স্পষ্ট নির্দেশ '...the basic requirements as indicated in the attached sheet are to be strictly adhered to at the time of recording of Rabindra Sangeet in future.' চিঠির সঙ্গে আলাদা করে বাংলায় লেখা একটি কাগজ ছিল। সেখানে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গানে যে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে সেগুলি হল :

'এস্রাজ, বাঁশী, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা, দোতারা, একতারা, বাসবেহালা বা অরগান, পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা, খোল, ঢোল ও মন্দিরা'। আরও কিছু নির্দেশ ছিল। বাদ্যযন্ত্রের তালিকাসহ মোট ছটি নির্দেশ ছিল। আমরা নির্দেশের প্রতিলিপি এখানে যোগ করছি।

রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী যন্ত্র

১। (ক) এস্রাজ, বাঁশী, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা, বেহালা, দোতারা, একতারা, বাসবেহালা বা অরগান।
(খ) পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা, খোল, ঢোল ও মন্দিরা।

২। প্রতি গানের মূল আবেগটির প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুকূল আবহসংগীত যন্ত্রে রচনা করে, আরম্ভে এবং যেখানে গায়কের কণ্ঠের বিশ্রাম প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করতে হবে।

৩। যে কটি যন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, গানের সঙ্গে তার সব কটিকেই বাজান যেতে পারে কিন্তু কোন যন্ত্রটি কিভাবে আবহসংগীতে বাজাবে সংগীত রচয়িতাকে তা স্থির করতে হবে গানের প্রতি ছত্রের ভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে।

৪। আবহসংগীত গায়কের গলার শব্দকে ছাড়িয়ে যাবে না কখনো। কণ্ঠের বিশ্রামের সময় বা গান আরম্ভের পূর্বে যখন যন্ত্রে আবহসংগীত বাজবে তখনও এই দিকটার প্রতি বাজিয়েরা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

৫। তালযন্ত্রের সঙ্গতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তালের ছন্দ বা বোল যেন কথার ছন্দ ও লয়ের বিপরীত না হয়। অর্থাৎ, দ্রুত ছন্দের গানে যেমন দ্রুত লয়ের ঠেকার প্রয়োজন ঢিমালয়ের গানে তেমনি ঢিমালয়ে ঠেকার প্রয়োজনকে মানতেই হবে।

৬। কথার উপরে ঝোঁক দিয়ে অনেক গান গাইতে হয়। এই সব গানের সঙ্গে সঙ্গতের সময় তালবাদ্যেও কথার ছন্দের অনুকূল ঝোঁকে প্রকাশ পাওয়া দরকার! তাতে গানের ভাবের সঙ্গে কথাব ভাবের সঙ্গতি থাকে।

রবীন্দ্রসৃষ্টির উপর কপিরাইট উঠে গেলে হয়তো বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের এই অকারণ কর্তৃত্বের অবসান হবে। শিল্পী বলেছেন, '—কি হবে জানি না—তখন হয়তো আমি ইহলোকে থাকব না।'

নিজেই নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন দেবব্রত। মিউজিক বোর্ডের সচিব নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি বইয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, নিজের অনুভূতির কথা সাজিয়ে ১৯৭২ সালে দেবব্রত দু-খানি গান লিখেছিলেন। সেই গান দুটো আমরা এই বইয়ে যোগ করেছি। নিজেই সেই গানের সুর দিয়েছেন দেবব্রত। প্রথম গান 'গুরুদেব, গুরুদেব, তোমায় গুরু বলে মানি'। দ্বিতীয় গান 'বিশ্ববীণার কলধ্বনি তোমার মনোবীণার তারে তারে'। গান দুটি দেবব্রত 'গুরুবন্দনা' শিরোনামে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিতে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেকর্ড করেছিলেন। চাইছিলেন, যতো দ্রুত সম্ভব শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে যাক। নিজে যেখানেই অনুষ্ঠান করতে যেতেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার আগে এই 'গুরুবন্দনা' শোনাতেন। তবে হয়তো কোনো গোপন কারণে সে গানের রেকর্ড সেদিন প্রকাশিত হয়নি।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে মিউজিক বোর্ড বাদ্যযন্ত্রের নির্দেশিকা দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল, দেবব্রত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তার দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। আমাদের মনে হয়েছে, একটি অসামান্য দলিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে শিল্পীর ইতিহাস চেতনা ও উপলব্ধি এতো স্পষ্টভাবে আর কোথাও তিনি বিবৃত করেননি। চিঠিতে অনাদিকুমার দস্তিদারের চলে যাওয়ায় কী ক্ষতি হয়েছে শুরুতেই বলেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পাম অ্যাভিনিউর বাড়িতে দেবব্রত অনেকবার গিয়েছেন। লিখেছেন, "তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি এবং শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে তিনি নানা ধরনের Experiment করতেন—ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে আমাদের শেখাতেন এবং আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন। কতগুলি রবীন্দ্রসংগীতের Harmony করা সুরে তিনি আমাদেরকে দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন; 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির Harmonised স্বরলিপি তৈরি করে 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন।"

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর বিষয়ে আমরা দু-এক কথা বলব। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রী বারো বছরের ছোটো ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কাল পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সময় তাঁকে পেয়েছিলেন। ১৮৯২ সালে ইন্দিরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রমথ চৌধুরীর

সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সাময়িকপত্রে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নানা লেখা ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ করেছেন।

মহিলাদের সঙ্গীত-সঙেঘর মুখপত্র 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকাতেই 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানের হার্মোনাইজড্ স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাঙালি চরিতাভিধান' লিখেছে, 'সঙ্গীতেও তিনি অনন্যা ছিলেন। দেশী ও বিদেশী সুরে এবং পিয়ানো, বেহালা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল।' 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া' সহ আরও প্রায় দুশো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি তাঁর হাতেই রচিত হয়। নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক একাধিক সংগঠনে যুক্ত ছিলেন। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, 'নারী আত্মরক্ষা সমিতি'-র সভানেত্রী হিসেবে তাঁকে পেয়ে বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত মহিলাকর্মীরা খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন।

ইন্দিরা দেবীর গানের কথায় যাই। তাঁর নিজস্ব একটি 'গানের বহি' ছিল। সেখানে ইন্দিরাতো লিখতেনই, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথও।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের 'আশ্বিন' মাস থেকে প্রধানত স্বরলিপি প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা বেরোয়। ইংরেজি হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শুরু। রবীন্দ্রনাথ তারপরেও দীর্ঘ চারদশক জীবিত ছিলেন। তিনি নিজে দেখেছেন, ইন্দিরা কী অসামান্য দক্ষতায় একের পর এক তাঁর গানের স্বরলিপি এই 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'-য় বার করেছেন। ইন্দিরা দেবী শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই যে সকল গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন, তার একটি তালিকা আমরা যোগ করতে পারি। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ডোয়ার্কিন এন্ড সন' 'বীণাবাদিনী' নামে একটি স্বরলিপি মুদ্রণের পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। খুব সামান্য কিছুদিন এই পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩০৪—অগ্রহায়ণ ১৩০৫) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও ইন্দিরা কয়েকটি গানের স্বরলিপি রচনা করেন।

কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে : আশ্বিন ১৩০৪
আজি যে রজনী যায় : পৌষ ১৩০৪
তুমি কি গো পিতা আমাদের : পৌষ ১৩০৪
কে এসে যায় ফিরে ফিরে : ফাল্গুন ১৩০৪
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা : বৈশাখ ১৩০৫

'সঙ্গীত-প্রবেশিকা' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই পত্রিকায় ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপি রচনার তালিকা দীর্ঘ।

১৩১২ বঙ্গাব্দ

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে
আমায় বলোনা গাহিতে বলোনা
আমার সোনার বাংলা
আমি ভয় করব না, ভয় করব না
যে তোরে পাগল বলে
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
ও আমার দেশের মাটি
সার্থক জনম আমার
ওরে তোরা নেই বা কথা বল্লি
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবনা
মা, কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি
আমাদের যাত্রা হল শুরু
ছি ছি চোখের জলে
তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
নিশিদিন ভরসা রাখিস
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
যদি তোর ভাবনা থাকে
আপনি অবশ হলি তবে

১৩১৩ বঙ্গাব্দ

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে

১৩১৪ বঙ্গাব্দ

কেন এলি রে ভালবাসিলি
আমার মাথা নত করে দাও

শিল্পীর আঁকা কার্টুন চিত্র

শিল্পীর আঁকা কার্টুন চিত্র

শিল্পীর আঁকা কার্টুন চিত্র

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে

দেবব্রত বিশ্বাস

শিল্পীর আঁকা কার্টুন চিত্র
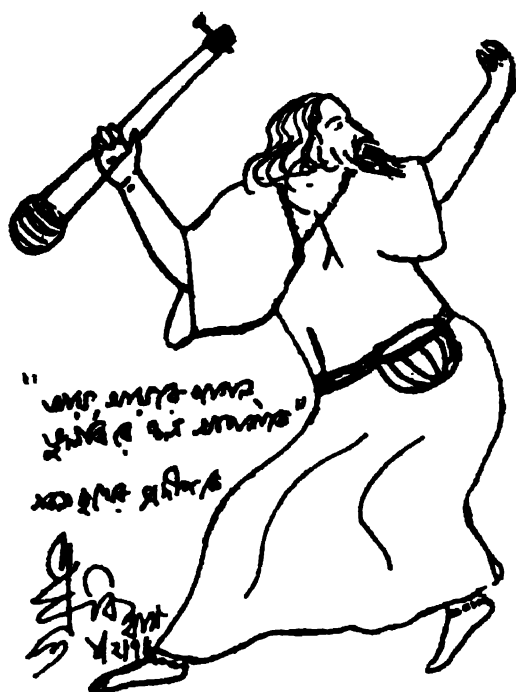
জনৈক চীনদেশীয় শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র

আরও প্রচুর গান রয়েছে যাঁদের স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লিখিত। সেই তালিকায় নিশ্চয়ই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী থাকবেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে এমন যাঁর স্বভাব প্রবেশাধিকার, তাঁর কাছে সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেও দেবব্রত 'ব্রাত্য' থেকে গেলেন 'বিদ্বজ্জন'দের কাছে? আশ্চর্য মনে হয়।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার দেবব্রতর গান প্রসঙ্গে লিখেছেন। কোথাও তিনি আপত্তির কথা তুলেননি। শৈলজারঞ্জন দেখেছেন, রেবা রায়ের নৃত্যানুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথ যেমন কটুকথার ঘায়ে আক্রান্ত, তাঁর নিজের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। দিনেন্দ্রনাথের কাছে চৌদ্দটি গান শিখে শৈলজারঞ্জন নেত্রকোণায় (তাঁর জন্মস্থান) ফিরে যান। রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করেন। তারপর তাঁর লেখা থেকেই পড়ুন।

"তখনকার দিনে মেয়েরা প্রকাশ্যে গান করত না। নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মেয়েরা গাইলেন। 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে' গানটি একবার একটি মেয়েকে দিয়ে করিয়েছিলাম। তার জন্য খুব সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তো বলেই বসল একটি অবিবাহিত মেয়ের মুখে একটি অশ্লীল গান দিয়ে আমি নাকি ভালো করিনি। শুনে গুরুদেব বলেছিলেন, তুমি করেছ কী? তোমার যে গলা কাটেনি!

স্বরলিপি যে যত্ন করে শিখতে হয়, সেকথা ইন্দিরা দেবী, অনাদিকুমার, শৈলজারঞ্জন, দেবব্রত সকলেই বুঝতেন। খোদ শান্তিনিকেতনেই এ বিষয়ে সকলের আগ্রহ ছিল। লিখছেন শৈলজারঞ্জন, 'আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ স্বরলিপির ধার ধারতেন না।...স্বরলিপির বই হয় লাইব্রেরিতে থাকত, নয়তো দিনুবাবুর কাছে থাকত।'

শৈলজারঞ্জন দেবব্রতের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'দেবব্রত, কনক দাস—এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রাবীন্দ্রিক করে গাইতেন বলেই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।' গানের 'লয়' নিয়ে মিউজিক বোর্ড প্রশ্ন তুলেছিল। সে বিষয়ে শৈলজারঞ্জন বললেন, স্বরলিপির নীচে এনিয়ে কোনো নির্দেশ থাকে না। না থাকলে এটা ঠিক, ওটা ভুল এসব বলা যায় না। 'তেমন তো কোন নিয়মকানুন নেই।' বলেছেন আরও, 'কখনো মিলিয়ে দেখিনি ওঁর গাওয়া অন্যান্য গানে সুরের তারতম্য হচ্ছে কিনা, কিন্তু ওঁরতো তারতম্য হওয়ার কথা নয়। দেবব্রত যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বড়ো হয়েছেন, আমরা সে সুযোগ পাইনি।'

কে জানে, তেমন করে বড়ো হওয়াটাই হয়তো অনেকে মেনে নিতে পারেননি।

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের চিঠির চরিত্র একরকম। এর বাইরে দুই বাংলার অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতা তাঁকে চিঠি লিখতেন। সামান্যতম সারবত্তা থাকলেও তিনি উত্তর দিতে ভুলতেন না। উত্তরের কপি করে রাখতেন। একটা ফাইল ছিল। 'পাগলা-ফাইল'। সেখানেই সব থাকত। যে মানুষটি আদ্যন্ত মজার মানুষ, তিনি তো চিঠিতে নানারকম মজার কথা লিখতেনই। গুণমুগ্ধতা যখন কারও মোহমুগ্ধতায় পৌঁছে যেত, তিনি সেই মনকে নির্মমভাবে ধাক্কা দিতেন। কী মজা ভাবুন। শৈবাল মিত্র 'অন্তরঙ্গ চীন' বইয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে দেবব্রত সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই কিছু প্রশস্তিবাক্য যোগ করেছিলেন। দেবব্রত উত্তরে জানালেন, শৈবালবাবুর চিঠি পেয়ে তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর এতো গুণ আছে! চিঠিটি আমরা এই বইয়ে দিয়েছি।

১৯৪২ সালে ১৭৪ই রাসবিহারীর ঠিকানায় এসেছিলেন দেবব্রত। দুজন নিত্যসঙ্গী ছিল তাঁর। অনন্ত আর শ্রীমন্ত। কাকা-ভাইপো। বাড়িতে থাকত তার চিররুগ্ন ভাইপো কুমারশঙ্কর। মামা-ভাগ্নে আর কাকা-ভাইপোর বিচিত্র সংসার। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ভাগ্নেকে তিনি জোর করেই প্রায় তাঁর কাছে রেখেছিলেন। মায়ের মতো আগলে রেখেছেন। প্রখর সঙ্গীতবোধ ছিল সেই ভাগ্নের। তাকে সারিয়ে তুলবেন ভেবে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। অকালে চলে যায় সে। নাগরিক জীবনের এখন যেরকম হালচাল, কেউ অতিথি হয়ে এলে প্রহর গুনি আমরা, কখন সেইমুখ আমাদের আড়াল হবে। কাকে আমরা 'নীলকণ্ঠ' বলব? জানেন দেবব্রত, যাকে নিজের বুকে আগলে রাখতে চাইছেন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, তাকে সাধ্যমত আনন্দে রেখে তিনি বিষণ্ণতার আবহ শতযোজন দূরে তাড়িয়ে দেবেন। এমন কাজের সামর্থ্যের দুর্গমতা গভীর ভাবে না ভাবলে অনেকে অনুভব-ই করবেন না।

মানুষটি তিনি কেমন মাপের ছিলেন, আরও একটি কাহিনি থেকে আমরা বুঝতে চাইব। ১৯৭৪ বা '৭৫ সাল। রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট গীটার শিল্পী বটুক নন্দী ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান করবেন প্রথমে। তারপর দেবব্রত বিশ্বাস গান করবেন।

মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা বটুক নন্দীকে শুনলেন। খানিকটা বিরতির পর কচিকাঁচাদের আসর শুরু হল। সারাবছর ধরে ওরা অপেক্ষায় থাকে, কবে হবে এই অনুষ্ঠান। চলছিল যখন, একটা আওয়াজ ভেসে এল শ্রোতাদের দিক থেকে। কান পাততে

বোঝা গেল, একদল শ্রোতা 'এসব' শুনতে চাইছেন না। তাদের এক্ষুনি দেবব্রত বিশ্বাসের গান চাই। বটুক নন্দী ছুটে এসে দেবব্রতর কাছে হই চইয়ের কারণটুকু বললেন। শুনে দেবব্রতর প্রতিক্রিয়া 'পোলা-পানদের অনুষ্ঠান না শুইন্যা' অগো বাদ দিয়া আমার গান শুনব! এরা কারা আইসে!' একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে। পর্দা ফ্যালাইয়া দাও, আমার নাম ঘোষণা কর।' ঘোষণা শুনে হল জুড়ে একটা বড়োরকমের হাততালি শোনা গেল। দেবব্রত বটুক নন্দীকে বললেন, 'পর্দার সামনে দুইখান চেয়ার দিতে বলেন। একটা চেয়ারে আমার হারমোনিয়ামডা রাইখ্যা দিতে বলেন।' বাচ্চাগুলোর শুকনো মুখ।

দেবব্রত পর্দা খানিকটা ফাঁক করে সামনে এসে চেয়ারে বসেন। শ্রোতাদের নমস্কারও জানান। হারমোনিয়ামে আঙ্গুল চলে। সুর উঠে আসে, 'কেন তোমরা আমায় ডাকো'। গাইছেন না তখনও। দর্শক শ্রোতারা গভীর আগ্রহে। তারপর শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে তিনি কী বললেন শুনুন।

> 'উপস্থিত মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী আমি ভালোভাবেই জানি আপনারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানকে এতই ভালোবাসেন যে তার পরিচয়—রবীন্দ্রসদনের একটি আসনও অপূর্ণ নেই। অনুষ্ঠান সূচীর বিজ্ঞাপন দেখেই টিকিট সংগ্রহ করেছেন। বটুক নন্দীর গীটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যন্ত্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথের গান ও কণ্ঠে আমার গান—দেবব্রত বিশ্বাস। দুইপর্ব। আমি শুনলাম উপস্থিত শ্রোতাদের হয়তো সকলে নয় কিছু অংশের দাবি প্রথমপর্বের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে মঞ্চে আমায় হাজির হতে হবে। অতএব এতদিন ধরে বটুক নন্দীর প্রতিষ্ঠানে যে সব কচিকাঁচারা তাদের গুরুর কাছে তালিম নিয়ে রবিঠাকুরের গান গীটারে শিখেছে সেই সব কচিকাঁচারা রবীন্দ্রসংগীতের সুরগুলো বাজিয়ে আপনাদের কাছে শোনাবে ও তার থেকে উৎসাহ পাবে, এটাই ছিল তাদের আশা। শিশুমনের সেই শুদ্ধ-আশায় জল ঢেলে দিলেন। তাদের অনুষ্ঠান মাঝপথে বন্ধ করে আমার গান শোনার দাবি করেছেন। এ এক ধরনের অপরাধ। সেই-শ্রোতাদের আমি অনুরোধ করি, আমার গান নিশ্চয়ই শুনবেন কিন্তু শর্ত হবে একটাই। দুই পর্বের অনুষ্ঠানে যে সময় ভাগ করা আছে সেটাই হবে অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট শর্ত। অর্থাৎ কচিকাঁচারা যতক্ষণ তাদের অনুষ্ঠানে কবিগুরুর গান বাজাবে তার সবটাই শুনতে হবে এবং তবেই আমি আমার গান পরিবেশন করবো। যদি মনে হয় এ শর্তে আপনারা যাঁরা অনাগ্রহী তাদের করজোড়ে বলি, আপনারা টিকিটের মূল্য ফেরত পাবেন। কিন্তু যদি আপনাদের শর্ত আমি মান্য করি তবে এই কচিকাঁচাদের কাছে চিরকাল অপরাধী থেকে যাব। রবিঠাকুরের গান সারাজীবন গেয়ে তথাকথিত কিছু বিশেষজ্ঞ(!) বিদগ্ধ মানুষের কাছে আমি অপরাধী হয়েই আছি, আর নতুন করে এই ফুটন্ত শিশুদের কাছে দ্বিতীয়বার অপরাধী করবেন না। (ঠোঁটে সেই পরিচিত

নিঃশব্দের হাসি)। জানি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, অপরাধী ভাববেন না, তাই এই আবেদন, দাবি। অন্য অর্থে হয়তো আবদার। একবার শুধু ভাবুন ঐ কচিকাঁচারা আপনাদেব এই অমানবিক আবদারের পরিচয়টা যদি তাদের প্রিয়জনদের জানায় তাহলে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসার পরিচয়টা তাদের কাছে কি হবে? একটু সময় দিলাম। ভেবে দেখুন। উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে সমবেত চিৎকারে শ্রোতারা তাঁর দেওয়া শর্ত মেনে নিলেন।'

পর্দা খুলে গেল। আবার মাতিয়ে দিল ওরা ওদের কচিহাতের ছোটো ছোটো আঙুলের স্পর্শে কবিগুরুর গান। শেষ হলো ওদের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান। পর্দা নেমে গেল। বিরতি। দ্বিতীয় পর্বের শুরু। তারপর অনন্য দেবব্রত। অন্য ছন্দে অন্য রূপে। এমন লিখতে গেলেই গোলাম মুরশিদের কথা মতে পড়ে। 'আশার ছলনে ভুলি' লেখার পরে তাঁর বহু গুণাগুণের কথা হয়তো মানুষ ভুলে গিয়েছে। দেবব্রতর সঙ্গে একসময় তাঁর নিয়মিত পত্রবিনিময়ের সম্পর্ক ছিল। অতি সম্প্রতি একটি বইয়ে তাঁর লেখা দেখতে পেলাম যেখানে তিনি বলেছেন : 'প্রথম যিনি ভারী গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন—১৯৩০ এর দশকে—তিনি হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। বস্তুত, পঙ্কজ মল্লিক, তারপর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস মিলেই ভারী গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন মান এবং আদর্শ স্থাপন করেন।'

আমি যখন ত্রিপুরায় কলেজের ছাত্র, দেবব্রত বিশ্বাসের গান শোনার সুযোগ হয়েছিল। মনে পড়ে হীরা দে ও পদ্মিনী চক্রবর্তী, ত্রিপুরার বিশিষ্ট দুই নৃত্যশিল্পী তাঁর একটি করে গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। ত্রিপুরায় নবেন্দু চৌধুরী ছিলেন জর্জ বিশ্বাসের পূর্বপরিচিত। ময়মনসিংহের লোক দুজনেই। 'ছন্দনীড়' অনুষ্ঠানের আয়োজক। নবেন্দু চৌধুরী পদ্মিনী চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠালেন। পরিচয় করিয়ে বললেন, 'পদ্মিনী ভালো নাচে'।

—'নাচ করেন নাহি? গানের সঙ্গে নাচবেন দয়া কইর‍্যা?'

পদ্মিনীদি উত্তরে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আপনি বললে নিশ্চয়ই করব।' তাঁর তখন মাথায় নেই, দেবব্রতকে যে সংস্থা নিয়ে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। তবে যাই হোক, বড়ো কাজে ছোটো বাধা ভেসে যায়।

জর্জদা গাইলেন 'আলোর অমল কমল খানি'। পদ্মিনীদি এক সাক্ষাৎকারে আমায় বলেছিলেন, 'এমনভাবে গাইছিলেন দেবব্রত, আমি নাচব কী, নাচটা তো তাঁর গানেই দেখতে পাচ্ছিলাম।'

অন্যদিকে হীরাদিও বেশ মজার গল্প শুনিয়েছেন। তাঁকে যখন দেবব্রত 'আপনি' করে বলছেন, হীরাদি বলেছিলেন, 'আমি আপনার অনেক ছোটো। আমাকে আপনি বলছেন কেন?' তড়িৎগতি উত্তর ছিল শিল্পীর, 'আগে বিয়া কইর‍্যা লাইছেন ক্যান?' হীরাদির নাচের সঙ্গে শিল্পীর গান ছিল 'ওরে চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিল কে'। নাচের পোশাক কী হবে, তা-ও বলে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে আগরতলা শহরের 'রবীন্দ্রভবন'-এ এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। আমার স্মৃতিতে এখনও সেই দৃশ্য অমলিন। গান গাইছেন দেবব্রত। মালার পর মালা গাঁথছেন যেন।

কেমন ছিল শিল্পীর থাকার ঘর? এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছিল অনেকটা এরকম। একতলায় একচিলতে ঘর। বলা যায় হয়তো 'জর্জ মিউজিয়াম'। কেন? 'জর্জ মিউজিয়াম' কেন?

'চারপাশের দেওয়ালে তাক ঠাসা রবীন্দ্র সংগীতের বই। তার কতক ছেঁড়া, কতক উঁইয়ে কাটা। অন্যসব বইও কম নয়। বাঁধানো সোনার জলে নাম খোদাই করা 'দেবব্রত বিশ্বাস'। তার গা বেয়ে এপাশ ওপাশ দিয়ে টেপ রেকর্ডার আর স্টিরিওর তার নেমেছে, কখনও মেঝেতে কখনও পাশের তক্তপোষের উপরও পৌঁছে যায়। তক্তপোষের উপর ছড়ানো রাজ্যের ওষুধ-পত্তর, ইনজেকশান, হাত পাখা, পিকদানী, ভাঙ্গা ও ভালো চায়ের কাপ, হার্টপাম্প, জলের মগ, পেন, নোটবুক, চিঠিপত্র, অজস্র ক্যাসেট, ইতস্তত ছড়ানো রেকর্ড, আরও কত কি। ঘরের মাঝখানে বড় একখানা ইজিচেয়ার তোয়ালে দিয়ে চাপা, পায়ের কাছে মাটিতে হারমোনিয়াম, জলের কুঁজো আর গেলাস এককোণে, টেবিল ঘড়ি, হাতঘড়ি, চশমা খুলে রাখা বিছানার ওপর।'

আমার নিবেদনে আমি লিখেছি, রসিকতা করে (নাকি হৃদয়ের গভীরে খানিকটা বিষণ্ণতাও ছিল?) তিনি বলেছিলেন, কোনো 'রাবীন্দ্রিক' জিনিস আমার সহ্য হয় না। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরা কি তেমন-ই ছিল? প্রতিবেশিনী করবী ভট্টাচার্য লিখেছিলেন :

'...চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের কথা।...রোজই দেখতাম ঐ সময়ে (সকাল দশটা / সাড়ে দশটা) এক ভদ্রলোক (যাঁর পরনে লুঙ্গি ও জামা) একটি মোটর সাইকেল স্টার্ট করা নিয়ে যুদ্ধ করছেন, মুখ পানে ঠাসা, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু রসও গড়াচ্ছে। মোটর সাইকেলটি এক লাথিতে সাড়া দিত না, ক'বার লাথি খাবার পর সে গর্জন করে উঠত। তখন ভদ্রলোকটি মুখ তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে তাতে চড়ে বসতেন। রোজই চোখাচোখি হত। ওঁর অধ্যবসায় দেখে আমি

হেসে ফেলতাম, ওঁরই মুখে মুচকি হাসি দেখতাম।' (স্মৃতির আলোয় দেবব্রত বিশ্বাস—করবী ভট্টাচার্য, দেবব্রত বিশ্বাস অ্যাকাডেমি)

১৯৬১ সাল। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে দেশ জুড়ে। আমাদের দেশের বিশিষ্ট মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত সেই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কেমন ব্যবসা চলছে, ভুল বার্তা যাচ্ছে সকলের কাছে, এই ছিল তাঁর অনুষ্ঠান। দেবব্রত বিশ্বাস অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন। দেখার পর যোগেশ দত্তকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন :

'কও যোগেশ, এই কথাটা বেশি কইর‍্যা কও। আমরা তো আর কিছু কইতে পারি না, গুরুদেবের গান গাইয়া বেড়াই, তুমি এইটা জোরগলায় কও। সত্য কথা সত্যভাবে যদি না কইতে পারো তো কিছুই করতা পারবা না।' যাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান তিনি ঠিকমতো পরিবেশন করেননি, তাঁরা অনুগ্রহ করে কথাটা একবার ভেবে দেখবেন।

যে মানুষ এমন গভীর বাণী উচ্চারণ করতে পারেন, তিনিই আবার রসিকতার আমোদে চারপাশ ভরিয়ে তুলতে পারেন। একদিন যোগেশ দত্ত দেবব্রতর বাড়ি গিয়েছেন। এমন সময় এক অচেনা ভদ্রলোক এলেন। তারপরের কথোপকথন শুনুন।

জর্জদা বললেন, 'কী চাই'?

—'আমি দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে এসেছিলাম।

—'জানেন না? তার তো অসুখ, সে তো হাসপাতালে আছে। আমি রান্না করত্যাছি। রান্না কইর‍্যা তারে দিয়া আসুম।' ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, 'এই মিষ্টিগুলো রেখে দিন দয়া করে।'

—'না না, আপনে লইয়া যান। সে তো পি. জি.-তে।' উনি চলে যেতেই আমরা বললাম, 'এটা কী করলেন?' জর্জদা নির্বিকার চিত্তে বললেন, 'আমার এখন মিষ্টি খাওয়া বারণ। মিষ্টিগুলি রাখলে তোমরা আমার সামনে বইস্যা বইস্যা খাবা আর আমি দেখুম? তার চেয়ে ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়া গেলেন, সেই তো ভাল হইল।'

ঋতু গুহ তাঁর একটি লেখায় ('সকালবেলা তাকিয়ে দেখি') দেবব্রতর রসিকতার কথা বলেছেন।

"একবার পুলিশের একটা অনুষ্ঠানে জর্জদার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। সহাস্যে বললেন, 'আরে আপনে এখানে ক্যান? আমারে না হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃত করার জন্য পুলিশ খুঁজত্যাছে। গাইলেই অ্যারেস্ট করব।

তাই হ্যাডাদের সন্তুষ্ট করনের লাইগ্যা আইসি। আপনার তো ত্যামন সমস্যা নাই, আপনি আইসেন ক্যান?'

রসিকতা করতে পারতেন যেমন, মনে কিছু দুঃখও বয়ে বেড়াতেন। ভাগ্নে কুমারশঙ্করকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন তিনি। ১৯৭০ সালে তাকে চিরকালের মতো হারিয়ে তিনি যে কতোটা কষ্ট পেয়েছেন, তা আমরা হয়তো অনুমান করতে পারি, অনুভব করতে পারি না। গানের জগতেও তাঁর ছোটোখাটো দুঃখ ছিল। শ্যামল মিত্র যে গান গাইলেন, গাইতে চেয়েছিলেন তিনি। সলিল চৌধুরীর যে গান তিনি গণনাট্য সংঘে গাইতেন, তার রেকর্ড করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'ছোটোখাটো' বললুম কেননা শ্যামল মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শিল্পীকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। দুজনকে দেবব্রতও ভালোবাসতেন খুব। সলিল চৌধুরীর লেখা পড়ছিলাম। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'অবাক পৃথিবী' গাইতেন জর্জদা। 'কি আসাধারণ যে গাইতেন!' যদি তাই হবে, কেন দেবব্রত রেকর্ড করতে পারলেন না? সলিল চৌধুরীর সুরে দুটো গান তিনি রেকর্ড করেছিলেন। 'আমার প্রতিবাদের ভাষা' আর 'চলো চলো হে মুক্তি সেনানী'। সলিল চৌধুরীর মতো সুরকার বলেছেন, 'সেটুকুই আমার কাছে সম্পদ হয়ে আছে।'

সুরকার দেবাশিস দাশগুপ্ত (১৯৩২-১৯৯১) আজ বেঁচে নেই। অকালে চলে গেছেন তিনি। তাঁর কিছু গানের সুর, বিশেষত নাটকের গান, আজও বেঁচে আছে। সুরের ব্যাকরণ নিয়ে কথা বলার অধিকার ছিল তাঁর। সেই যোগ্যতা তিনি প্রমাণ দেখিয়ে অর্জন করেছিলেন।

দেবব্রত ছিলেন 'ব্যারিটোন ভয়েস'-এর অধিকারী। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গেয়েছেন দেবব্রত। দেবাশিস দাশগুপ্ত আমাদের জানিয়েছেন, এ গানে দেবব্রত 'গভীরে যেতে পারেন—ঝড় আনতে পারেন গলায়, কণ্ঠেই বোঝাতে পারেন কখন দীপ নিভে গেছে, কখন উদাসিনী বেশে বিদেশিনী আসে।'

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দেবব্রতকে 'জর্জকাকা' বলে ডাকতেন। কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে হেমন্ত একবার বলেছিলেন, 'অবাক পৃথিবী' তাঁর চেয়ে জর্জকাকা ভালো গাইতেন। 'আমি যদি গানটা দশ-বারোবার রেকর্ড করতাম তবু জর্জকাকা যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, আমি তা পারতাম না।' একবার রবীন্দ্রসঙ্গীতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের পর হেমন্তের নাম বলতেই হেমন্ত সমরেন্দ্রকে খানিকটা রুষ্ট হয়েই বলেছিলেন, 'আমি নয়, পঙ্কজ মল্লিকের পর যদি কারো নাম করতে হয় তিনি জর্জকাকা। তুমি বোধহয় জর্জকাকার গান তেমন করে শোননি সমরেন্দ্র!'

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা কথা আমাদের বারবার মনে পড়ে। যখন দেবব্রতর গান বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি, দেবব্রত গান রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর উত্তরে বলেন, 'এ ব্যাপারে বিশ্বভারতীর খানিকটা দোষ আছে। কারণ আমরা যে সব গান শিখেছিলাম, সেগুলোর স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা। উনি সেই স্বরলিপি অনুসারেই গাইতেন, যার সাথে এখনকার স্বরলিপির অনেক তফাৎ। আর Spirit, Tempo ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে বিচারটা তো সহজ নয়। True Spiritটা দেখাবে কে?'

মনের যা গড়ন, যা মেজাজ, দেবব্রত সম্বর্ধনা গ্রহণের মানুষই নন। রাজিও হতেন না তিনি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। বহু অনুরোধ করে ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে (১৮ই মার্চ) রবীন্দ্রসদনে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে দেবব্রতকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বৌদি কনক দাসের ভালোবাসাজড়িত তিরস্কার বর্ষিত না হলে তা-ও যেতেন কিনা সন্দেহ। তিনিও বা কম যান কিসে! কথা আদায় করে নিলেন, বৌদিকে তাঁর পাশে থাকতে হবে। তার আগের বছর ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শিশির মঞ্চে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। কতোদিন পর শ্রোতাদের সামনে গান গাইলেন শিল্পী! 'এই মণিহার আমায় নাহি সাজে'। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কতকালের চেনা দুজনার! তাঁর কথা ফেলতে পারেননি। দুই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের বেলাতেই ছিল হল কানায় কানায় ভর্তি। মনে পড়ে রসিক দেবব্রতর এক অসামান্য সংলাপ। বৌদির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুরুদেব নাকি তেনারে দেইখ্যাই কৃষ্ণকলি গান ল্যাখছিলেন।' হলময় হাসির কলরোল। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে হেমন্তকে বলেছিলেন তিনি, 'আমি কিন্তু গামুনা'; তুমি বিপদে পড়বা।' হেমন্ত উত্তরে বলেছিলেন, 'গাইবেন না, যদি চান আমি বিপদে পড়ি তো পড়ব। বলবো, কাকা যে কটা গান গাইতে পারবেন না, সে কটা আমিই বেশী করে গেয়ে দেবো।' বলার প্রয়োজন পড়ে না, রবীন্দ্রসদনে গিয়ে নিজের কণ্ঠ তিনি রুদ্ধ করে রাখতে পারেননি। শ্রোতাদের গান শুনিয়েছেন। 'কিংশুক' আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভার যারা সাক্ষী ছিলেন তারা সেই স্মৃতি জীবনে কখনো ভুলতে পারবেন না। মঞ্চ অন্ধকার করে গান গাওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সব বাতি জ্বলে উঠত। তিনি গান গাইতেন। শ্রোতাদের অনুভবের সাক্ষী থাকতে চাইতেন।

নাটকে অভিনয় করেছেন দেবব্রত। খুব বেশি করেননি। চলচ্চিত্রেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন, এমন কথা বলা যায় না। তবে নাটকের চেয়ে বেশি অভিনয়

করেছেন। 'ভুলি নাই' ছবিতে মুকুন্দ দাসের ভূমিকায় তাঁর উদাত্ত ও তেজস্বী কণ্ঠস্বর কে ভুলবেন?

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'উজান গাঙ বাইয়া' বইয়ের একজায়গায় লিখেছেন :

"দেবব্রত বিশ্বাসের মতো কালো, মোটা চেহারা—প্রায় পুরোই একরকম দেখতে—শুধু একটু লম্বা। 'ভুলি নাই' ছবিতে যখন জর্জদা মুকুন্দ দাসের চরিত্রে আসেন, তখন মনে হয় যেন সেই ছোটবেলায় দেখা মুকুন্দ দাসকেই দেখছি। গমগমে জোয়ারি ছিল মুকুন্দ দাসের কিন্তু কোনো অলঙ্কার ছিল না গলায়।" ১৯৪৮ সালে পরিচালক হেমেন গুপ্ত এই ছবিটি তৈরি করেছেন।

ঋত্বিক ঘটকের তিনটি ছবিতে গান গেয়েছেন দেবব্রত। দুটি ছবিই বলা ভালো। 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) ও 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১)। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' (১৯৭৪) ছবিতে তিনি 'কেন চেয়ে আছো গো মা' গানের শুধু খানিকটা গেয়েছিলেন। গানের বাকি অংশ গেয়েছেন সুশীল মল্লিক।

ছবিতে ঋত্বিক ঘটক দেবব্রতকে দিয়ে গান করবেনই। কেন? ঋত্বিক বলতেন, 'জর্জদা শব্দকে দেখতে পান। রবীন্দ্রসঙ্গীত ওকে বাদ দিয়ে...অ্যাবসার্ড।

মেঘে ঢাকা তারা (সাদা-কালো), ১৯৬০
৩৫মি.মি. — ১২৬ মি.
প্রযোজনা : চিত্রকল্প
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু
আলোকচিত্র : দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
সংগীত : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জী
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
শব্দ : সত্যেন চ্যাটার্জি ও মৃণাল গুহঠাকুরতা
প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎকুমার মিত্র
নেপথ্য কণ্ঠ : এ টি কানন, দেবব্রত বিশ্বাস,
রণেন রায়চৌধুরী এবং গীতা ঘটক
আবহ সংগীত : বাহাদুর হুসেন খাঁ, লক্ষ্মী ত্যাগরাজন
ও মহাপুরুষ মিশ্র
গান : যে রাতে মোর ...।
মুক্তি : ১৪/৪/৬০
শ্রী, পাচী, ইন্দিরা